বিনিময়

বিশ্বনাথ রায়

তুলি-কলম
১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৭০
জুলাই, ১৯৬৩

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
দ্বিবাস্পতি দত্ত
সাক্ষর মুদ্রণী
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শচীন বিশ্বাস

লেখকের অন্যান্য বই

নানারঙ

বহ্নিকন্যা

মুক্তবিহঙ্গ

নতুন নগর

চৌধুরী বাড়ি

ডাক্তারের ডায়েরী

নতুন দিনের আলো

শ্রী ভূষণ দাস

শ্রদ্ধাভাজনেষু

॥ এক ॥

ডান হাতে ওষুধের ব্যাগটা নিয়ে শৌভিক বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। দুপুরের ঝাঁঝালো রোদে মাথার তালু জ্বলে উঠছে। আশে পাশের ছায়ার সন্ধানে চোখটা ঘুরিয়ে নিল। না। কোন আশা নেই। হনহনিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে দক্ষিণগামী বাসের জন্য অপেক্ষায় দাঁড়ায়।

ব্যাগটা ফুটপাতের ওপর রাখে। হাত ঝনঝনিয়ে গেছে। এক গাদা ওষুধের স্যাম্পেল আর লিটারেচার পুরে নিয়ে এসেছে হেড-অফিস থেকে। সেল্‌স্‌ ম্যানেজারের শাসানি এখনো মাথার মধ্যে ঘুরছে, এ মাসে বিক্রি না বাড়লে চাকরি রাখা মুশকিল হয়ে পড়বে। বড় সাহেব বলে দিয়েছেন।

বিজিনেস বাড়াতেই হবে। শৌভিকের মাথাটা আরো গরম হয়ে ওঠে। কি করে ওষুধ বিক্রি করবে তারই ফন্দী চলে মস্তিষ্কের আনাচে-কানাচে। লোকে ওষুধ কিনবে কি করে? যে দাম সব ওষুধের। ডাক্তার অনেক সময় খাতির করে দু-একটা প্রেসক্রিপশন করে দেন। কিন্তু করলে কি হবে? ওষুধের দাম শুনে রোগী প্রেসক্রিপশন হাতে ফিরে চলে যায়।

বাস এলো। শৌভিক ব্যাগ হাতে উঠে পড়ে। কোন রকমে ঠেলেঠুলে একটু জায়গা করে দাঁড়ায়। মুশকিল হয় হাতের ব্যাগটা নিয়ে। রাখবে কোথায়? ভিড়ের চাপে মানুষই দাঁড়াতে ঠাঁই পায় না, তার আবার ব্যাগ। কণ্ডাক্টর আপত্তি জানিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে, ও কি মশাই? দুম্বো ব্যাগটা নিয়ে উঠেছেন কেন?

—ব্যাগটা কি করবো?

—ও সব নিয়ে কলকাতার বাসে ওঠার নিয়ম নেই।

—দুদিন বাদে বললেন, জামাকাপড় পরে উঠেছেন কেন? শৌভিকও ছাড়বার পাত্র নয়।

কণ্ডাক্টর ক্ষেপে আগুন। বাসের সহযাত্রীরা ওদের কথাবার্তায় বেশ মজা পান। আরো উস্কে দেন, বলুন দাদা, আরো বলুন।

কণ্ডাক্টর শৌভিকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, ব্যাগ আর জামা-এক হল?

শৌভিকের মুখে হাসি। ঠাট্টার সুরে বলে, এক কি মশাই? আরো বেশি।

কণ্ডাক্টর ক্ষেপে লাল—ওসব বাজে কথা রাখুন এখন।

—এটা বাজে কথা হল? শৌভিক কণ্ডাক্টরের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওটা ফেলে দিতে পারেন? পারেন না—কারণ ওইটের ভিতরেই আপনার যত কিছু। আমারও ঠিক তেমনি এই ব্যাগটার মধ্যে চাকরি। এটা যাওয়া মানে চাকরি খতম, আর চাকরি খতম মানে বাসে ওঠা খতম।

কণ্ডাক্টর কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধি করে মনে মনে। কথা না বাড়িয়ে গম্ভীরভাবে বলে—ভাড়া দিন।

—পকেটে আছে। বের করে নিন।

—আপনার পকেটে আমি হাত দেব কেন? কণ্ডাক্টরের মেজাজ আবার সপ্তমে চড়ল। শৌভিকের মুখে মোলায়েম হাসি।—চটেন কেন? আমরা তো ভাই-ভাই। আপনি টিকিট বিক্রি করতে বেরিয়েছেন, আমি বেরিয়েছি ওষুধ বিক্রি করতে। দেখছেন তো দু-হাতই জোড়া। ডান হাতে ব্যাগ, বাঁ হাত আপনার রডে। দিই কি করে?

কণ্ডাক্টর আর কোন কথা না বলে শৌভিকের প্যাণ্টের পকেটে হাত চালিয়ে দেয়। একটা আধুলি বেরিয়ে আসে। টিকিটের দাম কেটে নিয়ে খুচরো পয়সা আর টিকিটটা পাশ-পকেটে ফেলে দিয়ে অন্য যাত্রীর কাছে এগিয়ে যায়।

শৌভিকের নামার স্টপেজ এসে পড়ে। ঠেলে-ঠুলে বাস থেকে

নেমে পড়ে। বাসের লোকেরা ওর দিকে তাকিয়ে দেখে। দরজার মুখে দুজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা পথ করে দেন। পাদানী থেকে ফুটপাতে নামার সময় শৌভিক শুনতে পেল একজন অপরজনকে বলছেন, লোকটা একেবারে ভাঁড়।

ভাঁড়! কথাটা কানে গিয়েছিল শৌভিকের। বোধহয় মনেও লেগেছিল। নিজের মনেই একবার হেসে ফেলল সে। কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে এম. এস্‌সি. পাশও করেছিল বছর কয়েক আগে। তখন কত স্বপ্ন ছিল দুচোখে। জগদীশ বোস কি আচার্য প্রফুল্ল রায়ের কাছাকাছি একটা কিছু হবেই। কিন্তু হল না কিছুই।

হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। দাদার একার রোজগারে সংসার চলা অসম্ভব। বিধবা মা, বউদি আর বউদির একটি পাঁচ বছরের কন্যা সংসারের বাসিন্দা। দাদা এক সদাগরী অফিসে নব্বুই টাকার কেরানী। অতএব সংসারে দাঁড় টানার জন্য সরস্বতীর পুজোয় ইস্তফা দিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনায় বেরিয়ে পড়তে হল। নানা জায়গায় চাকরির খোঁজ করেছিল, কিন্তু নিরাশ হয়ে বাড়ি ফেরা ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না তখন। অনেক দরজায় হোঁচট খেয়ে বছর দেড়েক আগে এই পাগলা কোম্পানিতে এসে যোগ দেয় 'মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ' হিসেবে। ওষুধ বিক্রি করতে হবে নানা অঞ্চলে। মাইনে শ' দুয়েকের মত, তার সঙ্গে পথ-খরচা। সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটা নিয়ে নিয়েছিল শৌভিক। তারপর প্রতিদিন ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করে, ওষুধের দোকানের সামনে ধর্না দিয়ে তার মনের জগদীশ বোস মরে গিয়ে ফুটে উঠল একটা ভাঁড়।

শৌভিক মিত্র কথাটা ভাবে আর হাসে। আরও হাসি পায় কোম্পানির কথা যত ভাবে। অন্যান্য কোম্পানির কথা সে শুনেছে। বিলাতী বিখ্যাত কোম্পানিগুলোর কথাই নেই। পকেট ভরে টাকা, মন ভরে মান দেয়। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটে, পদক্ষেপের ধারা দেখেই বোঝা যায় জীবনে কোন চিন্তা কোন সমস্যা নেই। আধুনিক দেশী

কোম্পানিগুলোও এদিকে নজর দিয়েছে, রিপ্রেজেন্টেটিভদের জন্মে মোটা মাইনে, মোটা অ্যালাউন্সের বন্দোবস্ত করছে। প্রভিডেন্টফাণ্ড তৈরি করেছে, কর্তৃপক্ষ বুঝতে শিখেছে, এরাই হচ্ছে কোম্পানির প্রাণ। এদের পেটভরে খেতে দিলে, প্রাণভরে কাজ করবে, আর এদের কাজের ওপর নির্ভর করে কোম্পানির অর্থলাভ।

অথচ শৌভিকের কোম্পানি এক পাগলা কোম্পানি। পৃথিবীর ওপর দিয়ে যুদ্ধ চলে গেছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে, তার কোন হদিসই রাখেন না বড় সাহেব। উনিশশো তিরিশ সালে স্থাপনা করেছিলেন এই কোম্পানির ভিত্তি, তারপর নিজের চেষ্টায়, নিজের অধ্যবসায়ে এই অবস্থায় এনে ফেলেছেন। বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি। বাইরে বেরোতে পারেন না, ঘরে বসেই কাগজপত্র দেখেন আর মাঝে মাঝে ব্যবসার অবনতি দেখে চিৎকার করে গাল পাড়েন। বলেন, সকলকে তাড়িয়ে দেবো।

সবাই চুপ তাঁর সামনে। কেউ বলতে সাহস করে না, আজকের পৃথিবী তোমার অচেনা সাহেব। তুমি আজও পড়ে আছো যুদ্ধপূর্ব যুগে, যখন একটা ভিটামিনের শিশি, বাড়ি তৈরি করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আজ নতুন ধরণের ওষুধ হয়েছে, নতুনতর চিকিৎসার সৃষ্টি হয়েছে। তার একবিন্দু রশ্মিও সাহেবের জানালা ভেদ করে ঘরের মধ্যে আসে না। কম ব্যবসা হলে সাহেব ভুরু কুঁচকে যখন জিজ্ঞেস করেন, হোয়াই, হোয়াই সো ব্যাড বিজিনেস? সেলস রিপ্রেজেন্টে-টিভের দল মুখ বুজে থাকে। কোন উপায় নেই। তর্ক করতে গেলেই উত্তর আসবে, ইউ আর নট কম্পিটেন্ট্। ইউ মে ট্রাই এল্স্হোয়ার।

বিচিত্র সাহেব, আরও বিচিত্র তাঁর স্বভাব। হঠাৎ কোনদিন সকালে হয়তো খেয়াল হল, সেলস্এর সমস্ত লোকদের ডেকে ঈশ্বর-তত্ত্ব শুনিয়ে দিলেন। ঘণ্টা দেড়েক বক্তৃতা দেবার পর শেষ মন্তব্য করলেন, বিলিভ্ ইয়োর গড এণ্ড ডু ইয়োর ডিউটি। আবার হয়তো কোনদিন ভীষণ চটে গিয়ে তুচ্ছতম কারণে গোটাকয়েক রিপ্রেজেন্টেটিভের ছাঁটাই পর্ব হয়ে যায়। অনেকদিন শৌভিক দেখেছে, হাসিমুখ নিয়ে কেউ হয়তো

অফিসে এসেছে। এসে দেখল টেবিলের ওপর আঁট-জোড়া খাম। খুলে দেখেছে ছোট্ট লেখা: ইয়োর সার্ভিস ইজ নো লংগার রিকোয়ার্ড।

বড় সাহেবের কথা শুনলে শৌভিকের অনেক সময় মধ্যযুগীয় জমিদারের কথা মনে পড়ে যায়। সে যুগ আর নেই, একথা সাহেবকে বোঝাবে কে? বোঝাতে গেলেই সাহেব অগ্নিশর্মা। ক্ষেপে যাকে সামনে পাবে, তাকেই সোজা বরখাস্ত করে ছাড়বে। তা সে জেনারেল ম্যানেজার হোক আর আর্দালীই হোক।

অনেকে শৌভিককে বলেছে, এ পাগলা কোম্পানি ছেড়ে অন্য কোন কোম্পানিতে কাজ নিতে। বিদ্যা আছে, কিছু অভিজ্ঞতাও হয়েছে এ লাইনে। শৌভিকের যে একেবারে ইচ্ছে হয়নি, তা নয়, তবু ছাড়েনি। সে ভেবেছে, দেখাই যাক না, কতদিন কাজ করা যায়। এই চাকরি-যাবো-যাবো ভয়ের ভিতর একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ আছে। সেই অনুভূতি যখন বাড়ে, তখনই হাসি পায়।

আজ সত্যিই হাসি পাচ্ছে শৌভিকের। বড় সাহেব বলেছেন, বিজিনেস না বাড়লে, চাকরি খতম।

বন্ধ দরজায় কড়া নাড়তে পাঁচ বছরের ভাইঝি দরজা খুলে দিল। ঢুকে খুকুর হাতে ব্যাগটা দিয়ে দরজা বন্ধ করে শৌভিক জিজ্ঞাসা করে, মা কোথায়?

—ঘরে, তোমার জন্য বসে।

দুজনে ঘরে ঢোকে।

—এত দেরি? বউদি সুলতা দেওরকে জিজ্ঞেস করেন।

—আর বোলো না বউদি। ঘেন্না ধরে গেল অফিসের কাজে।

—কেন? আবার কি হল?

—আজই আবার বেরোতে হবে। এ মাসে বিক্রি না বাড়াতে পারলে চাকরি খতম।

—বড় সাহেবের হুকুম বুঝি? বউদির জিজ্ঞাসা।

—হুকুম নয়, বল হুমকি। জামা খুলতে খুলতে শৌভিক উত্তর দেয়।

—তাড়াতাড়ি স্নান করে এস। অনেক বেলা হয়ে গেছে। বউদির মিষ্টি তাড়া। শৌভিক স্নান-ঘরে ঢুকে পড়ে। একটু পরেই বেরিয়ে এসে বলে—কোথায়, ভাত দাও।

—ও মা! এর ভেতর চান হয়ে গেল? পূজোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—রিপ্রেজেণ্টেটিভদের ওসব করতে গেলে চাকরি রাখা যায় না।

—রাখ দিকি তোর বাজে কথা! যেদিন থেকে চাকরিতে বহাল হয়েছিস, সেইদিন থেকেই ওর এক কথা। চাকরি গেল, চাকরি গেল। যায় যদি তো যাক। তা বলে শরীরটা নষ্ট করবি?

শৌভিক মাকে রাগিয়ে দেয়। মায়ের সঙ্গে খুনসুড়ি কাটতে তার খুব ভাল লাগে। হেসে বলে—চাকরি গেলে অটোমেটিক্যালি শরীর ভেঙে যাবে! তার কসরৎ করতে হবে না। পেটে দানা না পড়লে—।

বউদির আগমনে মা-ছেলের কথায় বাধা পড়ে।

—চল ঠাকুরপো। ভাত বাড়া হয়ে গেছে।

—চল।

বউদির ভাত বাড়া পাশে। শৌভিক নিজেরটায় বসে। খুকু কাকার সঙ্গে বসে পড়ে। শৌভিক কলকাতায় থাকলে খুকু কাকার সঙ্গেই খায়, একথা খুকুও যেমন জানে, শৌভিকও তেমন জানে। তাই বাড়ির কেউ তেমন আপত্তি করে না।

—এবার একটা পাত্রী দেখি, কি বল? মা ঘরের কোণে পাথরের থালায় খাবার নিয়ে বসে ছেলেকে বলেন।

শৌভিক হো হো করে হেসে ওঠে।

—এইবার ভাল কথা বলেছ মা। তা, বিয়ে দিলে খাওয়াবে কি?

—কেন? এখন তো ভাল রোজগার করছিস।

—দূর! আমার চাকরি আবার চাকরি। আজ আছে, কাল

নেই। এ অবস্থায় পরের বাড়ির মেয়ে আনলে গালমন্দ শুনতে হবে।

—আসলে তোমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। বউদি ফোড়ন কাটে —তা, তেমন যদি কেউ থাকে তো বল না, বরণ করে ঘরে তুলে আনি।

—আছে নিশ্চয়ই একজন, শৌভিক হেসে বলে—তবে তার এখনো খোঁজ পাই নি।

—তোর সবতাতেই হাসি-তামাসা। মায়ের গরজানি।

শৌভিক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বউদিকে বলে, তোমাদের হাতে বুঝি পাত্রী আছে?

—বাংলাদেশে আবার পাত্রীর অভাব?

—তাহলে কথা দিলাম বউদি, যেদিন আমার চাকরি পার্মানেণ্ট হবে, সেই দিনই বিয়ের জন্যে রেডি হয়ে যাব।

খাওয়া-দাওয়ার পর লম্বা ঘুম দিয়ে যখন উঠল, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। দাদা অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। বউদি চা জলখাবার তৈরি করে ডাকল, ঠাকুরপো ওঠ, তুমি আজ আবার যাবে তো? জিনিসপত্র গুছোবে না?

আড়মোড়া ভাঙে শৌভিক। হেসে বলে—আমাদের আবার জিনিসপত্র। ডান হাতে ব্যাগ, বাঁ হাতে স্যুটকেস। ব্যাস্।

—তুই আজই যাবি? কৌশিক প্রশ্ন করে। কৌশিক শৌভিকের দাদা।

—হ্যাঁ দাদা। আজই।

—আর কতদিন এমনি বাউণ্ডলের মত ঘুরবি? কৌশিক প্রশ্ন করে।

—এ চাকরি করতে গেলে সারা জীবন।

—চাকরি তো নয়, যেন চরকিবাজী। দাদা মন্তব্য করেন, তারপরেই জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় যাবি?

—অনেক যায়গায়। প্রথমে যাব জামসেদপুর, সেখান থেকে রাঁচি। রাঁচি থেকে বাসে করে চক্রধরপুর, তারপর—

শৌভিকের গড়গড়ানি থামিয়ে দেয় কৌশিক—থামা দিকি তোর টুর প্রোগ্রাম। কবে ফিরবি বল?

—ঠিক নেই কবে ফিরব। বিজিনেস বাড়াতে না পারলে আর ফিরব না।

—তোর যত অলুক্ষণে কথা। কেন পারবি না? সিনসিয়ারলি করলে নিশ্চয়ই হবে।

—ওই তো আমাদের ট্রাজেডি দাদা। কেউ আমাদের বিশ্বাস করতে চায় না। তুমি দাদা—তুমিও বললে সিনসিয়ারলি চেষ্টা করলে ব্যবসা বাড়বে। তার মানে বলতে চাচ্ছ যে, আমি ভালভাবে চেষ্টা করছি না।

—না না, আমি তা বলিনি। অপরাধের সুর দাদার গলায়।—আমি তোকে ভরসা দিচ্ছিলাম।

বউদি ঘরে ঢুকে বলে—ওঠ ঠাকুরপো। এর পরে গাড়ি ধরতে পারবে না।

শৌভিক উঠে পড়ে অল্প সময়ের মধ্যেই জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলে। যাবার সময় এগিয়ে আসে। শৌভিক নিজের মনিব্যাগ থেকে দুটো দশ টাকার নোট দাদার হাতে দিয়ে বলে—দাদা রাখ।

—টাকা কোত্থেকে পেলি? মাইনে তো এখনো পাস নি। দাদা জিজ্ঞেস করলেন।

—অ্যাডভান্স টাকা নিয়েছি পঞ্চাশটা। কুড়ি দিয়ে গেলাম, তিরিশটাকা আমার কাছে রইল।

—এ টাকাটা রেখে দিলে পারতিস। কোথায় বিদেশ-বিভুঁইতে যাচ্ছিস, যদি দরকার লাগে।

—হুঁ্যা! অবজ্ঞার শব্দ করে শৌভিক বলে—যেন ব্রাজিল কি বেলজিয়াম যাচ্ছি, যে পকেট-ভর্তি টাকা নিয়ে যেতে হবে। যেখানে যাচ্ছি, ওই টাকাতেই হবে। চলি দাদা।

তারপর মা-বউদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খুকুকে আদর করে শৌভিক ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে চলল।

॥ দুই ॥

হাওড়া প্লাটফর্মে ঢুকে শৌভিক হতচকিত। কি করবে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারল না। লোকে লোকারণ্য। যেদিকে চোখ পড়ে শুধু মানুষের মেলা। এই মেলা দেখতে শৌভিকের ভারি ভাল লাগে। এই একটি ব্যাপারে মানুষ ঝগড়া ভুলে যায়, রেশারেশি ভুলে যায়, এক হয়ে পাশাপাশি বসে যে যার গন্তব্যের দিকে ছোটে। সবাই ছিটকে যাবে, কেউ হয়তো চলেছে মাদ্রাজ, কেউ বা সিমলা, আবার কেউ হয়তো বোনপাস, কেউ বা বীরশিবপুর। কিন্তু সবার মুখে একই রকমের আনন্দ, একই রকমের হাসি লেগে রয়েছে। বেড়ানোর আনন্দ আলাদা রকমের, বাড়িতে বসে এ আনন্দ বোঝা যায় না, এর জন্য বাড়ির বন্ধন কাটিয়ে পথে বেরিয়ে আসতে হয়। এই নেশা শৌভিকের রক্তে লেগে আছে, তাই সে বেছে নিয়েছে ছুটে-বেড়ানোর কাজ। আজ এখানে, কাল সেখানে।

রাঁচি এক্সপ্রেস্ ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। প্লাটফর্মের মাঝখানে ঝোলানো ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল আর মিনিট পাঁচেক আছে ছাড়ার। মাথার ওপর মুহুর্মুহু দৈববাণীর মতো যান্ত্রিক মহিলা কণ্ঠের প্রচার, রাঁচি এক্সপ্রেস্ ছেড়ে যাবার সময় আসন্ন।

ভিড়ে ভিড। অসম্ভব ভিড় হয় গাড়িটায়। এই একটিমাত্র ট্রেন এ লাইনে চলে সারা দিনরাতে। প্রত্যেক কামরার দরজায় লোক ঝুলছে। জানালার ফাঁক দিয়ে সারি সারি মাথা। একটা কামরার সামনে এসে দাঁড়াল শৌভিক। ভিড় যেন একটু কম। ওদিকে সিগন্যালের আলো

সবুজ হয়ে গেছে। গাড়ি ছেড়ে যাবার সংকেত। ব্যাগ আর সুটকেস কোনমতে বাঁ হাতে নিয়ে, ডানহাতে হ্যাণ্ডেলটা ধরে উঠে পড়ল পাদানীতে।

তিলধারণের জায়গা নেই কোথাও। আশে পাশে মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু নেই। যাঁরা বসে আছেন, বাধ্য হয়ে বাইরের দিকে মুখ করে আছেন, ভিতরের দিকে তাকিয়ে থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে।

—এই ভিড়ে আবার মেয়েছেলে। ভিড়ের ভিতর থেকে কার ফোড়ন শুনতে পেল শৌভিক। ভাল করে তাকিয়ে দেখে শৌভিকের সামনেই এক ভদ্রমহিলা। তাঁর মাথাটা রয়েছে শৌভিকের বুকের সঙ্গে সেঁটে। একটু পিছোবার চেষ্টা করল, কিন্তু নিরুপায়, শৌভিকের পিছনে আর একজন ততক্ষণে জুড়ে গেছে। পিছোবার কোন উপায় নেই। অগত্যা চোখকান বুজে এগিয়ে যেতে হল।

গাড়ি একটা নাড়া দিয়ে ছেড়ে দিল। সবাই একটু নড়ে চড়ে উঠল। সামনের ভদ্রমহিলা বেসামাল হয়ে শৌভিকের উপর এসে পড়লেন, তারপরেই লজ্জা পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সোজা হতে গিয়ে এক বিপত্তি। ভদ্রমহিলার খোঁপা, শৌভিকের বোতামের সঙ্গে আটকে গেছে। শৌভিকেরও উপায় নেই ছাড়িয়ে দেবার। তার এক-হাতে ব্যাগ, অন্যহাতে সুটকেস। হঠাৎ একটা পড়পড শব্দ কানে এল, পরক্ষণেই ভদ্রমহিলা বিচ্ছিন্ন হয়ে একটু এগিয়ে গেলেন। শৌভিক ঠিক করে উঠতে পারল না, ভদ্রমহিলার চুল ছিঁড়ল, না তার জামা ছিঁড়ল?

—ওই বেডিংটার ওপর বসুন। শৌভিক একটা বাঁধা বেডিংএর খালি কোণা দেখিয়ে বলল।

নিঃশব্দে ভদ্রমহিলা শৌভিকের আদেশ পালন করে। এই ভিড়ে, এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। যেটুকু আশ্রয় পাওয়া গেছে, সেইটুকু অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

—ধন্যবাদ। মেয়েটি বেডিংএর ওপর বসে জানায়।

—এই ভিড়ে, পুরুষদের কম্পার্টমেণ্টে উঠেছেন কেন? এবার

শৌভিকের তাড়া।

মেয়েটি মুখ তুলে তাকাল শৌভিকের দিকে। এতক্ষণে বেশ ভালভাবে মেয়েটিকে দেখার সুযোগ পেল সে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মেয়ে। ঢলঢলে মুখ, টানাটানা চোখ, কোঁকড়া চুল। কালো রঙের শাড়ি পরণে, তার সঙ্গে মিল করিয়ে কালো ব্লাউজ। ফরসা রঙের উপর কালো প্রসাধন বেশ সুন্দর মানিয়েছে।

মেয়েটি চোখ তুলে তাকিয়ে হেসে ফেলল। শৌভিকের কথার জবাবের বদলে আঙুল দিয়ে বুকের দিকে দেখিয়ে বলল, ওকি?

শৌভিকও চোখ নামিয়ে নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় লাল।

এক গোছা চুল বোতামের সঙ্গে ঝুলছে।

এদিক ওদিক নজর চালিয়ে দেয় শৌভিক। কেউ লক্ষ্য করছে কি না? তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে শৌভিক টিপ্পনী কাটল —এগুলো, এবারের জার্নির সুভেনির।

প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল শৌভিক, তবু মেয়েটির কথা শুনে বেশ বোঝা গেল, কথাটা তার কানে গেছে। জার্নিটা কতদূর?

—আপাততঃ টাটানগর।

—তার মানে পুরো রাস্তাটাই এইভাবে যেতে হবে।

—ওসব অভ্যেস আছে।

বেডিংএর পাশে সামান্য একটু জায়গা ছিল। তার মধ্যে কোন রকমে সুটকেস আর ব্যাগটা সেইখানে ঠেসে দিয়ে হাত খালি করে একটু হাঁফ ছাড়ল। —সত্যি বড্ড ভীড়। মেয়েটি চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—এ গাড়িতে বরাবরই খুব ভিড়। একটু থেমে শৌভিক বলল, দেখে মনে হয় একা যাচ্ছেন।

—হঠাৎ এ প্রশ্ন?

—কাউকে কাছাকাছি দেখছি না কি না।

—সত্যি, একাই যাচ্ছি।

—কতদূর ?

—রাঁচি।

—রাঁচিতেই থাকেন? শৌভিকের কণ্ঠস্বরে ঘনিষ্ঠতার প্রচ্ছন্ন প্রলেপ।

—না। যাচ্ছি।

—বেড়াতে ?

—না।

—তাহলে ?

—এ কামরা থেকে নেমে যেতে বলছেন ?

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে শৌভিকের আর সাহস হল না কথা বলতে। গনগনে চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। একটু পরে চাপা স্বরে বলল, অযথা কৌতূহল জানতাম মেয়েদেরই থাকে। সেই ভয়ে মেয়েদের কামরায় না উঠে, এখানে উঠেছিলাম, কিন্তু এখানেও সেই একই ব্যাপার—।

শৌভিক হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। আলোচনাটা যে এই দাঁড়াবে শৌভিক কল্পনাও করেনি।

গাড়ি ছুটে চলেছে রাতের অন্ধকারে। গাড়ির মধ্যের যাত্রীরা এই অবস্থাতেও নিদ্রাদেবীর আরাধনায় রত। কেউ ঢুলছে, কেউ বা পাশের লোকের গায়ে হেলান দিয়ে নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছে।

শৌভিকের চোখ দুটো কামরার ভিতরে একবার ঘুরে এসে আবার আটকে গেল মেয়েটির মুখের ওপর। ওরই মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে কোনমতে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। পিছনের বেডিংএর ওপর হেলান দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে। ঘুমের চেষ্টা করছে কি নিজের কথা ভাবছে বলা মুস্কিল।

শেষ রাতে রাঁচি এক্স্প্রেস জামসেদপুরে এসে থামল। শৌভিক জেগে ছিল। ঘুমিয়ে পড়লে কখন স্টেশন পার হয়ে যাবে, এই

ভয়ে সারারাত চোখের পাতা এক করেনি, করতে পারেনি।

ব্যাগ আর সুটকেস হাতে নিয়ে শৌভিক উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি ঘুমে অচেতন। মাথা এলিয়ে দিয়েছে পিছনের বেডিংএর ওপর, কোলের ওপর পড়ে আছে ভ্যানিটি ব্যাগ।

একবার ভাবল শৌভিক মেয়েটিকে ডেকে বিদায় নেয়, তারপরই নিজেকে সংযত করে নিল। অচেনা একটি মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে বিদায় নেওয়া, উচিত হবে না।

শৌভিক প্লাটফর্মে নেমে পড়ে।

জামসেদপুরে নেমে শৌভিক একবার ভাবল কি করবে? কোথায় রাত কাটাবে? হোটেলে উঠতে গেলে নিদেনপক্ষে দশ টাকা লেগে যাবে, অথচ কোম্পানি দেয় পাঁচ টাকা করে। বাকি পাঁচ টাকা নিজের পকেট থেকে দিতে হবে।

লেফট-লাগেজ অফিসে সুটকেসটা রেখে বাগচীবাবুর রেস্টুরেণ্টে এসে বসে।

চারটে পুরি আর তরকারির অর্ডার দিয়ে ডায়ারি-বইটা ব্যাগ থেকে বের করে চোখ বোলাতে থাকে শৌভিক। ডায়ারির পাতায় ডাক্তারদের নাম ঠিকানা লেখা আছে, কোথায় কখন যাবে তারই হদিস।

বয় শালপাতার ওপর চারখানা পুরি আর একহাতা আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট সামনে নামিয়ে দিয়ে যায়।

লুচি-তরকারি মুখে পুরতে পুরতে শৌভিক অ্যারাইভাল কার্ড বের করে লিখতে আরম্ভ করে দেয় হেড-অফিসে। জামসেদপুরে কখন পৌছেচে, কতদিন থাকবে, এখান থেকে কোথায় যাবে। কোন ক্লাসে এসেছে লিখতে গিয়ে নিজের মনেই একটু হেসে ফেলল সে। এসেছে থার্ড ক্লাসে। কোম্পানি সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া দেয় তাকে। থার্ড ক্লাসে এসেছে জানলে কোম্পানি কৈফিয়ৎ তলব করবে, তারপর শাস্তি-বিধান করবে। তার চেয়ে সেকেণ্ড ক্লাসের কথা লিখলেই ল্যাঠা চুকে গেল। টাকাকে টাকাও বাঁচল। ঝামেলার হাত থেকেও রেহাই পাওয়া গেল।

সবকিছু লিখে শৌভিক উঠে পড়ল। এবার যাবে ওয়েটিং-রুমে। ভালভাবে স্নানটা সেরে নেবে। তারপর লেফট-লাগেজ থেকে স্যুট-কেসটা ছাড়িয়ে নিয়ে ওয়েটিং-রুমে ফিরে আসবে। রাতের জামা-কাপড় ছেড়ে একটা ভাল স্যুট পরে নেবে। জামসেদপুরের ডাক্তাররা একটু উন্নাসিক। ভাল পোশাকের রিপ্রেজেণ্টেটিভ না হলে কাছেই ঘেঁসতে দেয় না, কথা বলা তো দূরের কথা।

হাতঘড়ির দিকে একবার নজর চালিয়ে দিল শৌভিক। বেশ বেলা হয়ে গেছে। ঘড়ির ছোট কাঁটা সাতটার কাছাকাছি। আজ-কের মধ্যে যতগুলো ডাক্তারের চেম্বারে হানা দেওয়া যায়, সে দেবে। কাল ভোরের ট্রেনে রাঁচি পালাবার চেষ্টা করবে সে। রাঁচিতে কাজ সেরে মোটরে চক্রধরপুর। তারপর দেখা যাবে কি হয়।

স্নান সেরে জামা-কাপড় বদলে শৌভিক ব্যাগ হাতে নেমে পড়ে টাটানগরের পিচ-বাঁধানো রাস্তায়। ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে এক পলক ভেবে নেয়, কোনদিকে যাবে সে? বার্মা মাইনস্-এর দিকে না যুগশালাইয়ের দিকে। পথের সাথী ডায়ারিটা বের করে ফেলে সে। দেখে যায় পর পর ডাক্তারদের ঠিকানা। কোনদিকে বেশি ডাক্তার থাকে, তাদের প্র্যাকটিস কেমন, কোনদিকে গেলে বেশি ব্যবসায় হবার আশা। যুগশালাইয়ের দিকে যাওয়াই ঠিক করে ফেলল। পরপর অনেকগুলো ডাক্তার আছেন এদিকটায়। কয়েক-জনের প্র্যাকটিসও বেশ ভাল ধরনের। ওদিকটা সেরে বিষ্টুপুর যাবে। সেখানে বাজারের কাছের ডাক্তারদের দেখা করে বিকেলবেলায় যাবে মেন্ হাসপাতালে। সেখানে যত ডাক্তার ডিউটিতে থাকবেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে না হোক প্রধান-প্রধানদের সঙ্গে কথা বলবে। ওষুধের কথা বলবে। ওষুধের স্যাম্পেল দেবে গুণাগুণ বিচার করার জন্যে। তারপর বলবে—যদি দু-একটা প্রেসক্রিপশন করেন।

থমকে দাঁড়াল শৌভিক। দুপাশে তাকিয়ে চলেছিল ডাক্তারের নাম খোঁজবার তাগিদে। হঠাৎ নজরে পড়ে গেল, বড় বড় হরফে

লেখা : 'অবিনাশ ফার্মেসী' তলায় তার চেয়েও বড় করে লেখা—ডাঃ অবিনাশ দত্ত। গলার টাই-নটটা ডানহাতে একবার ঠিক করে ঢুকে পড়ে শৌভিক। ঘরের ভিতরে রোগী ভর্তি। কেউ বেঞ্চিতে শুয়ে। কেউ বা বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে জ্বরের তাড়সে কোঁকাচ্ছে। চারিদিকে নজর বুলিয়ে নিল একবার। ডাক্তার ভিতরের ঘরে রোগী দেখছেন। একজন কম্পাউণ্ডার গোছের লোক একবার করে বাইরে আসছেন, একজনকে ডেকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছেন।

শৌভিক বসে বসে দেখে। রোগীর পরে রোগী আসছে, যাচ্ছে। একটু অবাক হয়েই ভাবে শৌভিক। মাস তিনেক আগে যখন এই দিক দিয়ে ঘুরে গেছে, এ ডাক্তারকে তো সে দেখেনি, এ চেম্বারও নজরে পড়েনি। এ ডাক্তার এলেন কোথা থেকে, এসেই বা এত প্র্যাক্‌টিস জমালেন কি করে?

একটু নড়ে-চড়ে বসে শৌভিক। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে? হাতঘড়ির দিকে তাকাল একবার। এখানে যদি সারা সকালটা কাটাতে হয়, তাহলে অন্য ডাক্তারদের সঙ্গে আর দেখা করা সম্ভব হবে না। ব্যবসার অবস্থা তাহলে যা হবে, ভাবতেও ভয় লাগে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাবার ভান করল। দু তিনজন লোকের ওপর হুড়মুড়িয়ে পড়ল। সবাই হৈ হৈ করে উঠল। রোগীরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ডাক্তার বাবু ভেতর থেকে কি হল কি হল বলে বেরিয়ে এলেন।

শৌভিক চোখ বুজে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে পড়ে থাকে। সে মরিয়া। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তার দেখা করতেই হবে।

ডাক্তারবাবু শুকনো মুখে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করেন, কি হল? ব্যাপার কী?

—অজ্ঞান হয়ে গেছে। পাশ থেকে এক রোগীর মন্তব্য।

—বোধ হয় মিরগী আছে। আর একজনের কণ্ঠস্বর।

শৌভিক একই ভাবে পড়ে থাকে। মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ চলে।

নাড়ী দেখলেন ডাক্তারবাবু। স্টেথোস্কোপ বুকে ঠেকেছে অনুভব করে শৌভিক। জামার ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বেশ বুঝতে পারে, তবু পড়ে থাকে মটকা মেরে। আর একটু থাকা দরকার।

—একে ভেতরে নিয়ে চল। ডাক্তারবাবু বললেন।

ধরাধরি করে ডাক্তারের ভেতরের ঘরে টেবিলের ওপর নিয়ে যাওয়া হল শৌভিককে। চোখ বুজে পড়ে থাকে সে, কান খাড়া। ডাক্তারবাবু কি বলেন শোনার চেষ্টা।

ডাক্তারবাবু হাঁকলেন,—বিশে, তিন নম্বর ইনজেকশন ঠিক কর। আর স্মেলিং সল্ট এর শিশিটা দিয়ে যা।

মনে মনে প্রমাদ গোনে শৌভিক। কি ইনজেকশন দেবে কে জানে ? তার চেয়ে স্মেলিং সল্ট ছোঁয়াবামাত্র উঠে পড়বে সে।

বিশে স্মেলিং সল্ট এর শিশি ডাক্তারবাবুর হাতে দিয়ে যায়। ছিপি খুলতেই শৌভিকের নাকে ঝাঁঝালো গন্ধ এসে ঠেকে আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে।

—কেমন বোধ করছেন ? ডাক্তারবাবুর জিজ্ঞাসা।

—একটু ভাল। টেবিল থেকে নামতে নামতে শৌভিকের উত্তর।

—নামবেন না। মাথা ঘুরে যাবে। আগে ইনজেকশনটা দিই, তারপর চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

—ইনজেকশন লাগবে না। ডাক্তারের সামনের চেয়ারে বসতে বসতে শৌভিক বলে—এ রকম অজ্ঞান প্রায়ই হয়ে যাই।

—স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। গম্ভীর ভাবে ডাক্তারবাবু বললেন।

তারপর একটু নরম গলায় জিজ্ঞাসা করেন,—কোন কোম্পানি থেকে আসছেন ?

কোম্পানির নাম শুনে একটু গম্ভীর হয়ে যান ডাক্তারবাবু। তাঁর মনে কিসের দ্বন্দ্ব চলেছে যেন। একটু বাদে বললেন,—দেখুন, আপনি অসুস্থ। কিছু অর্ডার দিতেই হবে। তা এক কাজ করুন না আপনা-

দের ইনজেকশনটা বাদে আর আর ওষুধের কিছু কিছু অর্ডার নিয়ে যান।

—কেন স্যার ? আমাদের রক্ত হওয়ার ইনজেকশনে অদ্ভুত কাজ হয়। ব্লাড ব্যাঙ্কের এক বোতল রক্ত দেওয়াও যা, আর আমাদের এক ফাইল ইনজেকশন—

শৌভিকের কথায় বাধা পড়ে। ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বলেন, না মশায়, ইনজেকশন কিছুতেই নেবো না।

একটু থামলেন ডাক্তারবাবু, তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, দেখুন আপনার কোম্পানি আমার প্র্যাকটিসের বরাত খুলে দিয়েছে। তাই এই অর্ডারগুলো দিলাম, নইলে তাও দিতাম না। আচ্ছা আসুন—।

অগত্যা উঠতে হল শৌভিককে। এবার যুগশালাই এর রাস্তায় হাঁটে। মনে মনে 'অবিনাশ ফার্মেসী'র ব্যবসায়ের হিসেব চলে। যাই হোক বউনিটা খারাপ হয়নি।

একটুখানি এগিয়েই পুরনো 'মজুমদার ফার্মেসী'। ডাক্তার বীরেশ্বর মজুমদার মালিক। গতবার শৌভিকের কাছ থেকে অনেক টাকার ওষুধ কিনেছিলেন। পশারও ভদ্রলোকের বেশ। শৌভিক নতুন ব্যবসার আশায় সেই দিকে চলল।

ফার্মেসীর সামনে এসে অবাক। একটিও রোগী নেই। একা ডাক্তার তাঁর ঘরে বসে। বাইরের ঘরে একজন মাত্র লোক রয়েছেন। বোধহয় তাঁর কম্পাউণ্ডার। গতবারে এই ভদ্রলোককে শৌভিক দেখেনি। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, হঠাৎ ভদ্রলোকের প্র্যাকটিস নষ্ট হয়ে গেল কেন ? বোধহয় উনি কোথাও বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে সবে বসেছেন।

শৌভিক নিজের নামের কার্ড ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ডাক আসে। ভিতরের ঘরে ঢুকে দেখে ডাক্তারবাবু গুম হয়ে তাঁর জায়গায় বসে। শৌভিক নীরব। ডাক্তারকে দেখে মনে হয় কোন গভীর শোকে মুহ্যমান।

—কি চান ? ডাক্তারের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

—আমি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। শৌভিকের স্বর মিইয়ে পড়েছে।

—কোন কোম্পানির?

কোম্পানির নাম বলতেই ডাক্তারের যেন ইলেকট্রিকের শক্ লাগল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন—কি বললেন? কোন্ কোম্পানির? কোম্পানির নামটা পরিষ্কার ভাবে আবার উচ্চারণ করে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ডাক্তারবাবু। শৌভিকের মনে হল এক জোড়া ছুরি সোজা তার দেহে এসে বিঁধছে। চাউনিটাতে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। কি করবে সহসা ভেবে পায় না। চৌধুরী বাবু! ডাক্তার মজুমদার হাঁকলেন। বাইরের ঘরের ভদ্রলোক পাশে এসে দাঁড়ালেন।

—সেই ইনজেকশনগুলো নিয়ে আসুন এখানে। ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে নির্দেশ দিলেন, তারপর, শৌভিকের দিকে তাকিয়ে বললেন—বসুন।

শৌভিক সামনের চেয়ারে বসে।

চৌধুরীবাবু বাইরের ঘর থেকে একগাদা ইনজেকশন টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। শৌভিক তাকিয়ে দেখে তার কোম্পানির ওষুধ। গতবার বিক্রি করে গিয়েছিলো। এখনো এতগুলো ইনজেকশন রয়েছে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখানে এবার ব্যবসায় পাবার আশা নিরাশা।

—চৌধুরীবাবু! আবার ডাক্তার মজুমদারের হাঁক। চৌধুরীবাবু বেজার মুখে এসে দাঁড়ান।

—কি বলছেন? বিরক্তি মিশিয়ে চৌধুরীবাবু বললেন।

—বড় সিরিঞ্জটা দিয়ে যান। ডাক্তারের কথা শুনে চৌধুরীবাবু অবাক। শৌভিকও অবাক। আর তো কেউ নেই। কাকে ইনজেকশন দেবেন?

—শুনতে পাননি? ডাক্তার খেঁকিয়ে ওঠেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চৌধুরীবাবু সিরিঞ্জ আনতে চলে যান।

—এগুলো আপনার কোম্পানির? ইনজেকশনগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে ডাক্তার মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ স্যার। উৎসাহভরা গলায় শৌভিক বললো—খুব ভালো ইনজেকশন। দুদিনও লাগে না রক্ত তৈরি হতে। আমাদের দেশে রক্তহীনতার রোগী এত বেশি—

শৌভিকের বক্তৃতায় বাধা পড়ে যায় চৌধুরীবাবুর আগমনে। তার দিকে তাকিয়ে শৌভিক হাঁ। ডান হাতে একটা পঞ্চাশ শিশির সিরিঞ্জ, বাঁ হাতে তুলো আর স্পিরিট।

—সব ওষুধগুলো সিরিঞ্জে ভরুন। নির্দেশ দেন ডাক্তার, কম্পাউণ্ডারবাবু সেইমত কাজ করেন। শৌভিক একটু অবাক হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত না থাকতে পেরে বলে—এত ওষুধ একসঙ্গে ভরছেন কেন?

—একদিনে সব রক্ত তৈরি করে ফেলবো বলে। ডাক্তারের রহস্যময় উত্তর।

—কার? অবাক বিস্ময়ে শৌভিক জিজ্ঞাসা করে।

—কার আবার, আপনার। ডাক্তার চীৎকার করে ওঠেন, তারপরেই দাঁড়িয়ে উঠে বলেন—নিন, জামার হাতা খুলুন।

শৌভিকের গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। সে নিশ্চিত জানে এত ওষুধ একসঙ্গে নিলে মৃত্যু অবধারিত। ডাক্তার কি তাকে খুন করবে নাকি?

—আমি নেবো কেন? শৌভিক গলা ঝেড়ে বলে—আমার তো অনেক রক্ত আছে।

—আরও হবে। সিরিঞ্জটা চৌধুরীবাবুর হাত থেকে নিয়ে বললেন, ধরুন ওকে, পালিয়ে না যায়।

শৌভিক ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে। ভিতরে ভিতরে ঘামতে শুরু করেছে সে। লোকটা কি পাগল হয়ে গেল নাকি? বোধহয় তাই। তাই প্র্যাকটিসের অবস্থা এমনি শোচনীয়।

—আমায় আপনি ইনজেকশন দিতে চান কেন? শৌভিক এবার

একটু রাগত স্বরেই বললো।

—কেন? শুনুন তাহলে। আপনার এই ইনজেকশন দিয়ে আমার তিনটে রোগী মারা গেছে। একমাসের ভেতর তিন তিনটে রোগী একই ওষুধের জন্য মরে গেল। সেই যে রোগীরা পালালো, আর এলো না। আপনার ইনজেকশনের দোষেই আজ আমার এই দশা। ওষুধ আপনার ভেতরেই পুরবো আজ।

ডাক্তার মজুমদার এগিয়ে এলেন। বেগতিক দেখে শৌভিক প্রাণ-পণে ছুট লাগায়। বড় রাস্তার ওপারে গিয়ে একবার পিছন ফিরে দেখে। না, ডাক্তার নেই। যাক বাবা, বাঁচা গেল। আচ্ছা পাগলার পাল্লায় পড়েছিল সে।

সন্ধ্যের পর স্টেশনে ফিরে আসে শৌভিক। সারাদিন খুব ঘুরতে হয়েছে। ব্যবসা মন্দ হয়নি। আর কিছু হলে এ মাসের কোটা শেষ হয়ে যাবে। অর্ডারের কপিগুলো আজ পাঠিয়ে দিতে হবে হেড-অফিসে, তার সঙ্গে ডেলি রিপোর্ট। সারাদিন কি কাজ করেছে, কোন কোন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তার রোজ-নামচা।

প্লাটফর্মের আলোর নীচে একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে শৌভিক। লেফ্‌ট লাগেজ থেকে সুটকেসটা ছাড়িয়ে নিয়েছে। ব্যাগ থেকে ডেলি রিপোর্টের খাতাখানা বের করে লিখতে আরম্ভ করে দিনের কাজের ইতিহাস। আজ রাতেই রিপোর্টটা শেষ করতে হবে। ভোরের গাড়ি ধরে রাঁচি চলে যাবে। সেখানে দিন কতক থেকে যাবে চক্রধরপুর। একটা রাত প্লাটফর্মে কাটিয়ে দিতে পারবে অনায়াসে। শৌভিক লিখতে আরম্ভ করে, টু দি সেল্‌স ম্যানেজার।—

বাগচীবাবুর রেস্টুরেন্টে এসে পুরি আর তরকারী পেট পুরে খেয়ে দোকানের কোণের বেঞ্চটা দখল করে বলে, রাঁচি এক্সপ্রেস এলে আমায় ডেকে দিও। বকশিশ পাবে।

বয় আশ্বাস দিয়ে বলে—ভাববেন না, ঠিক তুলে দেব।

শৌভিক ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙতে দেখে রাত প্রায় শেষ হতে চলেছে। প্লাটফর্মে একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে। রেস্টুরেণ্ট নিঃঝুম। ছেলেরা সব ঘুমে অচেতন। শৌভিক উঠে ব্যাগ সুটকেস হাতে বেরিয়ে এসে টিকিট চেকারকে প্রশ্ন করে, এটা কোন্ গাড়ি?

—রাঁচি এক্সপ্রেস।

—কতক্ষণ এসেছে? শৌভিকের ঘুমের নেশা ছুটে যায়। গাড়ি ফেল করলে সারাদিন পড়ে থাকতে হবে স্টেশনে।

—ছাড়বার সময় হয়ে গেছে। সিগন্যাল পড়ে গেছে। রেলকর্মী জানিয়ে দেন।

—টিকিট কাটার সময় পাবো?

—টিকিট বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে। টিকিট-চেকারের জবাব। নিরুপায় শৌভিক চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে অসহায় ভাবে। কোন সাহায্য যদি কোনদিক থেকে আসে, কিন্তু বৃথা।

—কি করি তাহলে? শৌভিকের গলায় অসহায়ভাব ফুটে ওঠে। আমায় যে যেতেই হবে আজ।

—উঠে পড়ুন, গাড়ি এক্ষুনি ছাড়বে। টিকিট-চেকার ভদ্রলোক বললেন, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গার্ডের হুইসিল বেজে উঠলো। আর কোন উপায় না দেখে শৌভিক ছুটলো ট্রেনের দিকে। ট্রেনে ভিড় অসম্ভব। একটিমাত্র ট্রেন এ লাইনে যায়। তার উপর রাঁচিতে বেড়াতে যাবার সময় এসে গেছে। ভিড়ের আর অন্ত নেই। গাড়ির জানালা দিয়ে লোকের মাথা বেরিয়ে রয়েছে। দরজা খোলা, কিন্তু মানুষ গাদা। পাদানীতেও মানুষ ঝুলছে। শৌভিকের মত সেল্‌স্-ম্যানও পাদানীতে পর্যন্ত একটু পা ঠেকাতে পারলো না।

গাড়ি নড়ে উঠলো, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। হতভম্বের মত শৌভিক প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, ট্রেন ওদিকে গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ শৌভিকের নজরে পড়ল ফার্স্টক্লাস কামরার দরজায় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে স্টেশন দেখছেন। দরজা খোলা। নিরুপায় শৌভিক একলাফে চলন্ত ট্রেনের পাদানীতে লাফিয়ে উঠে

হ্যাণ্ডেলটা আঁকড়ে ধরে।

—এ কামরায় জায়গা নেই। ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করতে উদ্যত। শৌভিক তখন মরিয়া। এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরা, অন্য হাতে ব্যাগ আর স্যুটকেস। শৌভিক চিৎকার করে ওঠে, দরজা বন্ধ করবেন না। পড়ে যাবো।

—তা আমি কি করব? দরজা বন্ধ না করলে, আমরা যে মরে যাবো।

—দরজাটা খুলে দাও। নইলে ভদ্রলোক পড়ে যাবেন যে।

কামরার ভিতর থেকে মহিলা-কণ্ঠ কানে আসে শৌভিকের।

—কিন্তু, যদি কিছু হয়। ভদ্রলোকের শঙ্কা।

—যা হবার হবে। দরজা খুলে দাও। ভদ্রমহিলার চাপা স্বরে সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞা।

আধ-খোলা দরজা সম্পূর্ণ খুলে গেল। শৌভিক কামরার ভেতরে উঠে, হাত থেকে ব্যাগ আর স্যুটকেস নামিয়ে রেখে লম্বা গোছের নিশ্বাস ছাড়ে। স্বস্তির নিশ্বাস।

—বসুন। ভদ্রমহিলা বললেন। শৌভিক এবার ভালভাবে কামরার ভিতরটা দেখে। স্বল্প আলোয় দেখতে পায়, আরোহী মাত্র দুজন। একজন মহিলা, অপরজন পুরুষ। মহিলার মাথায় ঘোমটা। এত অল্প আলোয় সিঁদুর চোখে পড়ছে না।

—কোথায় যাবেন? কি নাম? ভদ্রলোকের সন্দেহ-ভরা জিজ্ঞাসা। একবার জিনিসগুলোর দিকে, আর একবার শৌভিকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

—রাঁচি। খালি বেঞ্চটার কোণে আলতো ভাবে বসে শৌভিক উত্তর দেয়। নাম শৌভিক মিত্র।

—রাঁচিতেই থাকেন? ভদ্রলোকের গলায় ঘরোয়া হবার নিশানা।

—না। আমি ওষুধের সেলস্‌ম্যান। নানা জায়গায় ঘুরে ওষুধের

অর্ডার কালেক্ট করি। জামসেদপুর থেকে চলেছি রাঁচিতে, সেখান থেকে যাবো চক্রধরপুরে, তারপর চাইবাসা, তারপর হলুদপুকুর—।

শৌভিকের কথায় হোঁচট পড়ে ভদ্রলোকের গলার স্বরে। —শুয়ে পড়ুন। এখনও রাত অনেকটা আছে।

—আমি বাঙ্কে উঠে পড়ছি। শৌভিক স্যুটকেস আর ব্যাগ বাঙ্কে তুলে নিয়ে শুয়ে পড়বার ব্যবস্থা করে ফেলে। নীচে নবদম্পতি আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। একটু পরেই ট্রেনের গতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে শৌভিকের নাক ডাকতে আরম্ভ করে। সারাদিনের ক্লান্তির পর আর চোখ খুলে রাখার ক্ষমতা হয় না তার।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে শৌভিক। মুরী স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। বাঙ্কের ওপর চোখ কচলে বসে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে পুলিস, স্টেশন-মাস্টার আর গার্ড, সঙ্গে টিকিট-চেকার।

—ও মশাই। পুলিস ইনস্পেক্টর ঠেলা দিয়ে বলেন—উঠুন। বেলা তো শেষ হয়ে গেল।

বোকার মত শৌভিক চারধারে তাকায়। সেই দম্পতি গাড়িতে কোথাও নেই।

—কোত্থেকে আসছেন? গার্ডের জেরা।

—টাটানগর। বাঙ্ক থেকে নামতে নামতে শৌভিকের উত্তর।

—টিকিট কই? হাত বাড়ান টিকিট-চেকার।

—কাটবার সময় পাই নি। চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠেছি।

—দেখে দেখে এই কামরাতেই উঠলেন। পুলিসের ব্যঙ্গ। তার-পরেই গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—গাড়িতে আর কাউকে দেখে-ছিলেন?

—হ্যাঁ। এক দম্পতিকে দেখেছি।

—দম্পতি না ছাই। পুলিস ইনস্পেক্টর গর্জে উঠলেন, মেয়েটা ছেলেটার সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। খুঁজে বেড়াচ্ছি।

শৌভিক থ। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। এ আবার কি ঝামেলায়

পড়লো সে।

—নামুন গাড়ি থেকে। গার্ড বললেন—গাড়ি ছেড়ে দেবে।

বিনা বাক্যে শৌভিক তার জিনিসপত্র নিয়ে প্লাটফর্মে নামলো। টিকিট-চেকার পিছু পিছু নেমে বললেন—ভাড়া দিন, তার সঙ্গে পেনাল্টি।

খেসারৎ সমেত ভাড়া চুকিয়ে দেয় শৌভিক। অন্য সময় হলে বচসা করতো, কিন্তু এই অবস্থায় গলা থেকে একটা টুঁ শব্দ বেরোল না।

—কি নাম আপনার ? পুলিশ ইনস্‌পেক্টর খাতা বের করে জিজ্ঞাসা করেন।

শৌভিক নাম বলে।

—ঠিকানা ?

ঠিকানা দিল। ইনস্‌পেক্টর তাঁর খাতায় লিখে নিলেন।

—আপনি শেষ কোথায় তাদের দেখেছেন ? পুলিসের জেরা।

—টাটানগরে। তারপরে ঘুমিয়ে পড়ি।

—তার মানে টাটায় নামতে পারে নি। নেক্‌স্‌ট্ স্টপেজ ছিল চাণ্ডিলে। ওখানেই নেমে আবার মেন লাইনের দিকে পালিয়েছে। আচ্ছা, আমিও দেখবো, কতদূর পালাতে পারে। নিজের মনেই গর্জান ইনস্‌পেক্টরবাবু। একটুখানি থেমে আমতা আমতা করে শৌভিক বলে —এবার আমি যেতে পারি ?

—কোথায় ?

—রাঁচি। গাড়ি ছেড়ে দেবে এর পর।

—রাঁচিতে কোথায় থাকবেন, ঠিকানা দিয়ে যান। আপনাকে দরকার লাগতে পারে, আপনি ওদের দেখেছেন। দরকার হলে আপনাকে দিয়ে আইডেন্টিফাই করিয়ে নেবো।

—পুরোপুরি চিনতে পারব কি ? সন্দেহের গলায় শৌভিক জবাব দেয়—আধা আলোতে দেখেছিলাম।

—আদ্ধেক চিনলেই হবে। পুলিস সাহেব অন্যদিকে হাঁটা দিলেন।

শৌভিকও মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কোথা থেকে উটকো আপদ এসে জোটে সব তারই কপালে। এর পর গাড়িতে উঠতে না পারলে রাঁচি যাওয়া তার কপালে হয়ে উঠবে না। রাঁচি একটা বড় রকমের ব্যবসার কেন্দ্র। অনেক ডাক্তার আর বেশ কয়েকটা হাসপাতাল রয়েছে রাঁচিতে। তাছাড়া ওষুধের দোকান আছে অনেকগুলো।

ব্যবসায় বাড়াতেই হবে শৌভিকের। কে কোন্ মেয়েছেলে নিয়ে পালিয়ে গেল, দেখতে গেলে রিপ্রেজেন্টেটিভএর চলে না। তাদের যাযাবরী জীবন। চোখের সামনে দিয়ে কত রকমের কাণ্ড-কারখানা ঘটে যাবে। সব মনে গেঁথে রাখবার মত সময় কই ?

কলকাতা থেকে টাটানগর পর্যন্ত যে মেয়েটি তার সহযাত্রিনী ছিল, তার কথাও কি ভুলে গেছে শৌভিক।

না। ও সব ভাবতে নেই। ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা যাযাবরের অন্যায়।

শৌভিক আবার রাঁচি এক্স্প্রেসে উঠে বসল। মন্থর গতিতে গাড়ি এগিয়ে চলল গৌতমধারার দিকে।

।। তিন ।।

রঁাচি বাজারের কাছে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। আজ আর 'রিপ্রেজেণ্টেটিভ রেস্ট হাউস'এ থাকার ব্যবস্থা করা যাবে না, তাছাড়া এক রাত্রির জন্যে ওখানে না থাকাই ভাল। বড় বড় কোম্পানির মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভরা আসর জমিয়ে বসে আছে। তারা লং টুর এ বেরিয়েছে। রঁাচিকে কেন্দ্র করে সারা ছোট-নাগপুরটাই টহল মারবে বার বার। ডাক্তারদের কাছে ওষুধের শ্যাম্পেল নিয়ে যাবে গাদা গাদা। ডাক্তারের মন ভিজে যায় স্বভাবতই। গরীব রোগীদের জন্য যদি বিনা পয়সায় ওষুধ জুটে যায়, তাহলে সে কোম্পানির দিকে মন টলে যায় আপনা থেকেই। বড় বড় কোম্পানি সে সব আঁট ঘঁাট জানে ব্যবসার। ওদের রিপ্রেজেণ্টেটিভরা থাকেও জামাই আদরে। ভাল ভাল কোট-প্যাণ্ট-টাই। ফরসা ধবধবে সার্ট। মুখে অনেক পাওয়ার নিশ্চিন্ত হাসি। বড় কোম্পানি বোঝে, ওই সব মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ হল কোম্পানির প্রতিবিম্ব। ওদের দেখেই ডাক্তারের ধারণা হয় কোম্পানি সম্বন্ধে। ওরা যদি খেতে না পায়, ওদের মুখ যদি শুকনো থাকে, তাহলে কোম্পানি সম্বন্ধে উঁচু ধারণা তৈরি করাবে কী করে।

শৌভিক বাজার পার হয়ে 'শান্তি কেবিন' এর দরজায় এসে দাঁড়ায়। ছোট্ট হোটেল। বাঙালী মালিক। এর আগেও রঁাচিতে এসে এখানে উঠেছে শৌভিক।

কলিং বেল টিপতেই চাকর এসে দাঁড়াল। এক মিনিট শৌভিকের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল—আর জায়গা নেই বাবু।

প্রমাদ গোণে শৌভিক। পকেটে খুব বেশি টাকা নেই। বড়

হোটেলে থাকতে গেলে পকেটের রেস্ত এক রাত্তিরেই ফোক্কা। তাহলে অন্য কোথাও আর ঘুরে যাওয়া হবে না। ম্যানেজারকে ভুলিয়ে ভালিয়ে যদি এক রাতের মত রাজি করান যায়, তাহলে এ যাত্রার মত রক্ষে।

—ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে দেখা করব। শৌভিক বেডিং স্যুটকেস সমেত ঘরে ঢুকে পড়ে।

সেই পুরনো টেবিলের সামনে পুরনো ম্যানেজার তথা মালিক ঝুঁকে পড়ে দিনের হিসেব নিকেশ সারছেন। শৌভিকের পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন—পাঁচু বলল সীট্ নেই, শুনলেন তো।

কি কর্কশ কণ্ঠস্বর। অবাক লাগে শৌভিকের। এর আগের বারে যখন এসেছিল, তখন হোটেল প্রায় পুরো ফাঁকা। সে কি আপ্যায়ন ম্যানেজারের। দু বেলা তদারক। কখন কি কষ্ট হচ্ছে তার পুরো হিসেব নিকেশ। যাবার সময় বার বার বলেছিলেন, আবার যখন রাঁচিতে আসবেন, আমার এখানেই উঠবেন। এবার যে সম্পূর্ণ আলাদা মূর্তি।

—শুনেই তো ঢুকেছি। শৌভিকও নাছোড়বান্দা। যে করেই হোক, আজ রাতটা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এ রকমের ব্যবহার রিপ্রেজেণ্টেটিভ্‌দের কপালে প্রায়ই ঘটে। তার জন্যে ভাবতে গেলে কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করা যায় না।

—তাহলে আর দাঁড়িয়ে কেন? ম্যানেজার চশমার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি ছুঁড়ে দেন তির্যক ভাবে।

—আপনার সঙ্গে রফা করতে।

—রফা! কিসের রফা? ম্যানেজারের ঠোঁট দুটো জোড়া লাগতে চায় না।

—আজ রাতটা থাকার। বেডিং স্যুটকেস মাটিতে নামিয়ে ফেলেছে শৌভিক।

—কিন্তু—।

ম্যানেজারের কথাকে অসম্পূর্ণ রেখেই শৌভিক বলল, তার জন্যে

অবশ্য ভাড়া ঠিক দেব। শুধু আজকের রাতটা। কাল সন্ধ্যের বাসে চলে যাব।

—কিন্তু সব ঘর যে ভরতি। ম্যানেজারের মুখে সমস্যার রেখা।

—এই ঘরের কোণেই কাটিয়ে দেব।

নিরুপায় ম্যানেজারের রাজি হতে হয়। অফিস রুমের একপাশে একটা ক্যাম্প খাটের বন্দোবস্ত করলেন ম্যানেজারবাবু। শৌভিক অনুমানে বুঝল পাঁচুর ক্যাম্প খাটই তার কপালে জুটেছে। যাই হোকগে। বড় ক্লান্ত সে। আজ রাতটা একটু বিশ্রাম চাই। কাল সকাল থেকে আবার টো টো কোম্পানি। থাকবে সেই চক্রধরপুরে গিয়ে।

—পাঁচু। বাবুর রাতের খাবারটা জোগাড় করে আন। ম্যানেজারবাবুর নির্দেশ। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচু অদৃশ্য। ম্যানেজারবাবুর এ স কেত সে বোঝে। এর পরই খদ্দেরকে তাগাদা কববেন ম্যানেজারবাবু।

—স্যার, আপনার বিলটা যদি অ্যাডভান্স্—। কথাটা শেষ করলেন না ম্যানেজারবাবু। যেন সংকোচে ভিবের জড়তা কাটছে না।

—কত ?

—এমনিতে পার ডে আট টাকা নিই। আপনি ছ'টাকা দিন। ক্যাশ-মেমো কাটতে শুরু করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

মনে মনে হাসে শৌভিক। ব্যবসার নতুন এক ফ্যাশন উঠেছে তাড়াতাড়ি ক্যাশ-মেমো কাটা। একবার ক্যাশ-মেমো কেটে ফেলতে পারলেই খদ্দের নিরুপায়। দোকানদার ততোধিক নিরুপায় সুরে জানান, কি করব স্যার। ক্যাশ-মেমো না কাটলে নিশ্চয়ই কিছু কমিয়ে দিতাম।

এ ফন্দি শৌভিকও অনেকবার, অনেক দোকানে করেছে। আর কোন কথা না বাড়িয়ে টেবিলের ওপর টাকাটা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, স্নান ঘরটা কোন দিকে ?

—আসুন স্যার। ম্যানেজারবাবু টাকা হাতে পেয়ে একেবারে অন্য রকমের মানুষ। অতি বিনয়ে স্নান ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন—আপনি গা হাত ধুয়ে ফেলুন, আমি খাবার ব্যবস্থা করি গে।

শৌভিক স্নান সেরে, খেয়ে নিল, তারপর ক্যাম্প খাটটার ওপর নিজের বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুম তো আসছে না।

নরম খাটে শুয়ে ভেবেছিল বেশ আরামে ঘুমোবে, কিন্তু কই? চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। সিগারেট টানতে টানতে দেখল ম্যানেজারবাবু কাজ শেষ করে, আলো নিভিয়ে চলে গেলেন। পাঁচুর কাজকর্মও শেষ হল। হোটেল নিস্তব্ধ হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

শৌভিকের চোখে ঘুম নেই। নানা রকমের ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বউদির কথা, দাদার কথা, খুকুর কথা, অফিসের কথা—ট্রেনের সেই মেয়েটির কথা।

আশ্চর্য মেয়েটি!

ক্ষণিক পরিচয়ে বেশ মনে দাগ কেটে গেছে।

কিন্তু কেন? তার সঙ্গে কি এমন আলাপ হয়েছে, যার জন্যে মনে দাগ কেটে যাবে?

তাহলে কি—?

এ প্রশ্নের উত্তর শৌভিক জানে না। জানতে নেই। যাদের আজ এখানে কাল সেখানে কাটাতে হয়, তাদের মন বাঁধতে নেই।

পাশ ফিরল শৌভিক। সব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ব্যবসার কথা ভাবতে লাগল বার বার। কাল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে অনেক। সবাইকে নানাভাবে বোঝাতে হবে, তাদের ওষুধই হল সবচেয়ে সেরা। তারপর যেতে হবে ওষুধের দোকানে। কিছু অর্ডার নিতে হবে। তা না হলে হেড অফিসে ঢোকা সম্ভব হবে না। সেল্স্ ম্যানেজার বলবে—কিছুই করো নি হে শৌভিক।

কখন যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে শৌভিক, নিজেও জানে না,

ঘুম ভাঙ্গল পাঁচুর ডাকে।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে শৌভিক। বেশ বেলা হয়ে গেছে। বেশি দেরি হয়ে গেলে আবার ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা হবে না। যে যার কাজ সেরে দুপুর বেলায় বিশ্রাম করতে চলে যাবেন।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়ল শৌভিক। অনেকদিন পরে রাঁচি এসেছে সে। অনেক কিছু বদলে গেছে। অনেক নতুন নতুন ডাক্তার প্র্যাক্টিসে বসেছেন। নতুন হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। বিজিনেস বাড়ার প্রত্যাশা চারিদিকে।

নতুন হাসপাতালে প্রথম হানা দিল শৌভিক। ঝকঝকে তকতকে বাড়ি, চটপটে সব ডাক্তারের দল। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘোরা-ফেরা করছেন চারদিকে। আউটডোরে রোগীর ভিড়। এ সময়ে ডাক্তারদের নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। এ সময়ে দেখা করলে কিছুই মনে থাকবে না ডাক্তারদের। অন্যমনস্ক হয়ে কয়েকটা হুঁ হাঁ ছুঁড়বে, তারপর বিদায় দিয়ে নিজের কাজে লেগে যাবেন। শৌভিকের সব কথাই বৃথা হয়ে যাবে।

কাছাকাছি ওষুধের দোকানগুলো একবার ঢুঁ মেরে আসবার কথা ভেবে নেয় শৌভিক। সেই ভাল। দোকানগুলো ঘুরে আসতে আসতে আউট ডোর অনেক ফাঁকা হয়ে যাবে।

পায়ে পায়ে শৌভিক রাস্তার উল্টো দিকের দোকানে হাজির হল। বেশ বড় রকমের দোকান। রাঁচি ফার্মেসী। কাউন্টারে কয়েকজন কর্মচারী, খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত।

—এদিকে আসুন। দোকানে পা দিতেই শৌভিককে কোণের ভদ্রলোক ডাকলেন।

শৌভিক ব্যাগ হাতে এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। মোটা, কালো ফতুয়া গায়ে উঁচু একটা চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে পরম তৃপ্তিতে চুরুট টানছিলেন। মোটা কালো ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে তাঁর চোখ দুটো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সারা দোকানময়। এক মুহূর্তেই বোঝা যায়, ভদ্রলোক দোকানের মালিক।

—কোন কোম্পানির লোক? একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক।

কোম্পানির নাম করল শৌভিক।

ভদ্রলোকের নাকের দু'পাশ দিয়ে ঈষৎ কেঁপে উঠল, অবজ্ঞায়। চশমাটা এক দিকে হেলে পড়ল।—ও সব ওষুধ বিক্রি নেই।

—কিছু অর্ডার প্লেস করুন। দেখবেন বিক্রি হয়ে যাবে।

—ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে মীট্ করুন। ভদ্রলোক জ্ঞান দিতে শুরু করলেন—ডাক্তাররা প্রেসক্রপশন করলে, তবে ডিম্যাণ্ড বাড়ে ওষুধের আর ডিম্যাণ্ড বাড়লে বিক্রি আপনা থেকেই হয়।

—হাসপাতালে ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করব। তার আগে এখানে এসেছিলাম।

—ভুল করেছেন। ভদ্রলোকের মুখে ধোঁয়া মেশানো হাসি—আগে ওখানে, তারপর এখানে।

—আচ্ছা তাই ঘুরে আসি। নমস্কার করে পথে নামে শৌভিক।

আবার রাস্তা। দোকানের সাইন বোর্ড আবার খোঁজা। কোথায় ওষুধের দোকান। পর পর দুটো খাবারের দোকান। রোগীর আত্মীয় স্বজনের ভিড়ই বেশি। মন্দিরের পাশে আর হাসপাতালের পাশে মিষ্টির দোকান বেশ চলে।

একটা চায়ের দোকান। গলাটা কেমন শুকিয়ে এল চায়ের দোকান দেখেই। কিন্তু চা খাবার মত সময় নষ্ট করলে চলবে না। অনেক কাজ আছে। আবার হাসপাতালে যেতে হবে। ডাক্তারদের দিয়ে কিছু প্রেসক্রপশন করাতেই হবে, তা নাহলে এসব দোকান ওষুধ রাখবে না।

সামনে 'জয়কৃষ্ণ ফার্মেসী'। অত বড় না হলেও মন্দ নয় দোকানটা। মালিক বাঙালী। শৌভিকের অবাক লাগে, আবার ভালও লাগে দেখতে, এখনও ওই একটা ব্যবসায় আছে, যাতে বাঙালী টিকে আছে। বাংলার বাইরে অধিকাংশ ডাক্তার বাঙ্গালী, অধিকাংশ ওষুধের দোকান বাঙালীর।

—আসুন, আসুন। কাউন্টারের ভদ্রলোক আপ্যায়িত করলেন।

শৌভিক একটু সংকুচিত। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তাকে খদ্দের ঠাউরেছেন। ওষুধ বিক্রি করতে এসেছেন শুনলে নিজেকে গুটিয়ে নেবেন এক্ষুনি।

—বলুন কি চাই? সসঙ্কোচে ভদ্রলোকের নিবেদন।

ততোধিক সসঙ্কোচে শৌভিক নিজের বক্তব্য পেশ করল। কিছুক্ষণ ভদ্রলোক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর সোজা ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরে বেরিয়ে এলেন আবার, হাতে কয়েক বোতল ওষুধ।

—এগুলো দেখুন।

শৌভিক দেখল। তাদের কোম্পানির ওষুধ। বছর দুয়েক আগে কোন রিপ্রেজেণ্টেটিভ দিয়ে গিয়েছিল। বিক্রি হয়নি। পড়ে থাকতে থাকতে ব্যবহারের দিন পার হয়ে গেছে। আর বিক্রি করার উপায় না দেখে পেছনের গুদোমে চালান করে দিয়েছেন দোকানের মালিক।

—এ ওষুধগুলো কিন্তু ভাল। শৌভিক তবু চেষ্টা করে নিজের কথা বলতে।

—এগুলো ফেরৎ নেবেন? দোকানদারও চেপে ধরেন।

—নিশ্চয়ই। এগুলো পোস্ট করে পাঠিয়ে দেবেন। বদলে নতুন ওষুধ কোম্পানি থেকে পাঠিয়ে দেবে।

আশার আলো জ্বলে ওঠে ভদ্রলোকের মুখে।—সত্যি?

—আপনাদের সহযোগিতা করাই তো আমাদের কাজ। শৌভিক সুযোগ বুঝে কথাটা ছুঁড়ে মারে।

—তাহলে নতুন কিছু ওষুধ থাকলে নিয়ে যান অর্ডার, আর—হাসপাতালের ডাক্তারদের একটু বলে যান।

—তাই যাচ্ছি। অর্ডার স্লিপে ওষুধের নামগুলো লিখতে লিখতে শৌভিক বলল।

—আর একটা কথা। ভদ্রলোক কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বললেন—ডাক্তারদের বলবেন, জয়কৃষ্ণ ফার্মেসী থেকে যেন ওষুধ কেনে

সকলে। ভাল, টাটকা মাল পাবে।

—বেশ বলব। নির্বিকার সুরে শৌভিক বলে।

—রাঁচি ফার্মেসী জোচ্চোর একদম। বেটারা জাল ওষুধ বিক্রি করে—

শৌভিক ততক্ষণে অর্ডার স্লিপ লিখে ফেলেছে। এবার বিদায় হতে পারলেই বাঁচে। অন্য দোকানের নিন্দা কখনও করতে নেই। লোকে বলে মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ-এর কান খোলা থাকবে, কিন্তু মুখ কখনও খোলা থাকবে না। সব দোকানই তার বন্ধু। শত্রু বাড়িয়ে লোকসান ছাড়া লাভ নেই।

অর্ডার স্লিপে সই করিয়ে শৌভিক আবার হাসপাতালের পথ ধরে। এতক্ষণে আউটডোর অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। ডাক্তারদের দম ফেলার সময় হয়েছে। দু-চারটে কথা বলা যাবে।

আউটডোরের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের কার্ড পাঠিয়ে দিল শৌভিক।

যতক্ষণ ডাক না আসে, বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। এই নিয়ম প্রত্যেক হাসপাতালে।

মিনিট দশেক পরে ডাক এল। আউটডোরের রোগী দেখার ফাঁকে মিনিট পাঁচেক সময় করে নিয়েছেন ডাক্তারেরা। এক কাপ চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে নেবেন। এর পর চলবে আবার রোগী দেখা বেলা একটা পর্যন্ত। এর মধ্যে যে শৌভিকের দেখা করার সময় হয়েছে, ভাবতেও ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে দিনটা আজ সুপ্রসন্ন।

—বসুন। কয়েকটি তরুণ চিকিৎসক আপ্যায়িত করলেন শৌভিককে। বয়সে শৌভিকের চেয়ে ছোটই হবে। বেশ ভাল লাগে শৌভিকের। প্রত্যেকের মুখে একটা কর্তব্যের ছাপ। এত পরিশ্রমের মধ্যেও ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। হাসিমুখেই শৌভিককে অভ্যর্থনা করলেন।

শৌভিক বিনীত ভাবে নিজের বক্তব্য পেশ করল।

সবাই বেশ মন দিয়ে শুনলেন। ওদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ডাক্তারটি বললেন, কিছু স্যাম্পেল দিতে পারেন?

—নিশ্চয়ই স্যার। ব্যাগ খুলে কিছু স্যাম্পেল টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল শৌভিক।

শিশিগুলো পাশের ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিয়ে সেই ডাক্তার বললেন—তোমার সেই পুওর পেশেণ্টএর ওষুধ জুটে গেল, আর এই কোম্পানির কিছু প্রেসক্রপশন আরম্ভ করে দাও।

—আচ্ছা স্যার। ডাক্তারটি ওষুধগুলো নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শৌভিক ডায়রী বার করে ডাক্তারবাবুকে বলল—স্যার যদি কিছু মনে না করেন, আপনাদের ঠিকানাগুলো—।

এক এক করে ডাক্তাররা নিজেদের নাম ধাম জানিয়ে দিলেন। তরতরিয়ে ডায়রীতে নোট নিয়ে নিল শৌভিক। সব হেড অফিসে জানাতে হবে।

—আপনারা মাঝে মাঝে যদি এই রকম ওষুধ দিয়ে যান, তাহলে খুব উপকার হয়। ডাক্তারবাবু একটা সিগারেট ধরালেন—কত গরীব পেশেণ্ট ওষুধের অভাবে মারা যায়। আপনাদের কিছু ওষুধ পেলে আমরা তাদের আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারি।

শৌভিকের ভাল লাগে কথাগুলো। অনেকদিন মানুষের মুখ থেকে ভাল কথা শোনেনি সে। আজকের সমাজে মানুষ ভাল কথা বলতে, ভাল কাজ করতে ভুলে গেছে যেন। চকিতে দু একটা কথা কানে বাজলে মনকে নাড়া দিয়ে তোলে বই কি।

—পরের বারে আবার দিয়ে যাব। শৌভিক জানায়—এবার বেশি কোটা নিয়ে আসিনি স্যার।

—লজ্জার কিছু নেই। ডাক্তারবাবু বললেন—পরে দিলেও হবে।

এমন সময়ে আগের ডাক্তারের পুনঃ প্রবেশ।—স্যার, ওষুধগুলো ভজুয়ার ছেলেকে দিয়ে দিয়েছি। ভজুয়ার বউএর সে কি কান্না। আনন্দে যে মানুষ এমন কাঁদতে পারে, কখনও দেখিনি।

শৌভিকের স্নায়ুতন্ত্রে ছলাৎ ছলাৎ প্রতিধ্বনি। তার সামান্য

ওষুধে একজনের কি অসামান্য আনন্দ। তার চোখের কোণেও যেন জল চিকচিকিয়ে উঠছে। না। ও সব সেন্টিমেণ্ট ভাবতে নেই। সে যাযাবর। সাধারণ হাসিকান্নার বাইরে তার জীবনের পদক্ষেপ।

—আমি উঠি স্যার। শৌভিক ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—এঁর কিছু প্রেসক্রপশন করেছ? ডাক্তারের অনুসন্ধান।

—গোটা দশেক লিখে দিয়েছি। হাসতে হাসতে তরুণ ডাক্তারটি জানায়।

—ধন্যবাদ স্যার। আনন্দে ভরপুর মন নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে শৌভিক। পায়ের জোর বেড়ে গেছে অনেকখানি। পদক্ষেপ অনেক দৃঢ়।

—ও মশায় শুনছেন।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল শৌভিক। রাস্তায় এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে সে। কে ডাকছে ঠাহর করতে পারে না ঠিক।

—এই যে, এ দিকে।

এবার দেখতে পেল। রাঁচি ফার্মেসীর সেই চুরুটধারী। দোকান থেকে নেমে এসেছেন প্রায়।

এগিয়ে এল শৌভিক—কি বলছেন?

—ভেতরে আসুন। আপ্যায়নের কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ আলাদা রকমের।

শৌভিকও অবাক একটু। একটু আগে যে লোক প্রায় তাড়িয়ে দিচ্ছিল, তার কণ্ঠস্বরে এ রকম দরদ।

একেবারে কাউণ্টারের ভেতরে নিয়ে গেলেন শৌভিককে। কয়েক মিনিট চুরুটে মোটা রকমের টান দিলেন, তারপর একটা প্রেসক্রপশন এগিয়ে দিয়ে বললেন—এ ওষুধটা আপনাদের কোম্পানির?

চিকিৎসাপত্রের ওপর চোখ বোলাল শৌভিক। সত্ত প্রেসক্রপশন করেছেন ডাক্তারবাবু তার কোম্পানিরই ওষুধ।—হ্যাঁ।

—তা অর্ডার না নিয়ে চলে যাচ্ছেন যে।

—ডিম্যাণ্ড্ হলে আপনা থেকেই অর্ডার হত। খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারল না শৌভিক।

—ও সব কথা ভুলে যান। আবার মুখে ধোঁয়া মেশানো হাসি। —সব এক ডজন করে অর্ডার নিয়ে যান। ক্যাশ পেমেণ্ট।

অর্ডার শ্লিপ বার করে শৌভিক। পর পর লিখে যায় শৌভিক। বেলা প্রায় একটা। এর পর হোটেলে ফিরবে, বউদিকে একখানা চিঠি লিখবে, তারপর সন্ধ্যের সময় বাস ধরে চক্রধরপুর যাবে। ওখানে অনেক পুরনো ডাক্তার আছেন। ব্যবসা পাওয়া যাবে বেশ ভাল।

অর্ডার শ্লিপ দোকানের মালিককে দিয়ে সই করিয়ে শৌভিক হোটেলের পথ ধরে।

হঠাৎ চমকে উঠল সে। রাঁচি ফার্মেসীর সামনে এক ভদ্রলোক তারই দিকে তাকিয়ে আছেন। ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত। মুখটা চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছে বুঝতে পারছে না শৌভিক।

হয়ত কোন ডাক্তার হবে। হয়ত অন্য কোন লোক। দৈনিক কত লোকই তো দেখছে সে। কত লোকের সঙ্গেই তো কথা বলছে। সকলকে মনে রাখা কি সম্ভব?

একটা সাইকেল রিকসা চেপে হোটেলের পথে রওনা হল শৌভিক। লোকটার দিকে আর খেয়ালই করল না।

হোটেলে পৌঁছে জামা কাপড় বদলে প্রথমেই বউদিকে চিঠি লিখতে বসল শৌভিক—।

বউদি, এবারের ভ্রমণটা বেশ রঙীন। দেখা ট্রেনের ভেতর। খোঁপার চুল, আমার বোতামের সঙ্গে আটকে গিয়েছিল। অনেক টানাটানির পর খোঁপা ছাড়ল, কিন্তু চুল ছিঁড়ল। ছেঁড়া চুল বুকে ঝুলতে লাগল। রাজকন্যাই দেখিয়ে দিল, বলল ওগুলো কি? হেসে বলেছিলাম, ওগুলো এবারের ভ্রমণের স্মারকগুচ্ছ। পরিচয় আরও হয়েছে। যাচ্ছেন রাঁচিতে। কেন যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করাতে প্রচণ্ড ধমক। বললেন, অহেতুক কৌতূহল ভাল নয়। সত্যি বউদি জীবনে এই প্রথম অনুভব করলাম, চোখ রাঙানিও মিষ্টি লাগে।

কোথায় যাচ্ছে বল তো? রূপকথার দৈত্যের কাছে?

কি জানো বউদি, একবার ইচ্ছে হয়েছিল রূপকথার রাজপুত্রের মত তলোয়ার হাতে ছুটে গিয়ে রাজকন্যাকে সেই দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। কিন্তু পারলাম না। সকাল হবার আগেই জামসেদপুর এসে গেল। রাজকন্যা ঘুমে অচেতন। কথা পর্যন্ত হল না। নেমে যেতে হল। নামটা অবধি জানার অবকাশ পেলাম না।

নাম নাই বা জানলাম। অমন সুন্দর চুল, সুকেশা রাখলে কেমন হয়? এর পর যদি কোনদিন দেখা হয় সুকেশা বলে ডাকবো। জানি না সাড়া দেবে কি না?

আর একটা মজার ঘটনা ঘটেছে এবার। টাটানগর থেকে রাঁচি যাবার পথে এক কামরায় লাফিয়ে উঠে দেখি এক দম্পতি বর্তমান। আমি তাদের দম্পতি ভেবেছিলাম। পুলিশ তা ভাবেনি। মুরী স্টেশনে ঘুম ভাঙল পুলিশের ঠেলায়। উঠতেই জেরা, গাড়িতে যারা ছিল, তারা গেল কোথায়? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানতে পারিনি, কোন স্টেশনে তারা নেমে গেছে, অনেক কষ্টে রেহাই পেয়েছি। বলেছে, দরকার হলেই আমার সাহায্য নেবে।

আজ সন্ধ্যেবেলার বাসে চক্রধরপুর চললাম। কবে কলকাতা ফিরবো জানি না। তোমরা সাবধানে থেকো। আমি ভাল।

ইতি—।

রাঁচি-চক্রধরপুর বাস সার্ভিসের শেষ বাসটা দাঁড়িয়েছিল। সাড়ে ছটায় ছাড়ে। চক্রধরপুর পৌঁছুতে ঘণ্টা চারেক লাগে। এগারোটার মধ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে। রাতটা বিশ্রাম নিয়ে কাল সকাল থেকেই কাজে লেগে যাওয়া যাবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

দূর থেকে বাসটা দেখেই মন খিঁচড়ে গেল। সেই পুরনো কালো রঙের বাসটা। সেকেলে ঝরঝরে। সামনের একটা ছোট খোপে

মহিলা যাত্রীর সীট আর পিছন দিকে বড় খাঁচায় পুরুষ যাত্রীর স্থান। মেয়েছেলে না থাকলে অনেকসময় কণ্ডাক্টর সামনের দিকে তুলে নেয়, সেই আশায় শৌভিক জিজ্ঞেস করতে কণ্ডাক্টর বললো, না বাবু, আজ সামনে হবে না। এক মেমসাহেব আছেন।

অগত্যা শৌভিক পিছনের দরজা দিয়ে পুরুষদের খাঁচায় উঠলো। সব যাত্রীই কোল আদিবাসী। পুরুষ মেয়েছেলে সব একসঙ্গেই উঠেছে গাদাগাদি করে। বেঞ্চএর উপর যতজন ধরে বসেছে, বাকি সব মাঝ-খানের ফাঁকে আসর গেড়ে নিয়েছে। দিনের কাজ সেরে যে যার গ্রামে ফিরে চলেছে। সবার মুখে ঘরে ফেরার আনন্দ, সবাই হাসি-খুসী।

শৌভিক উঠতে একজন আদিবাসী ভদ্রতা করে জায়গা ছেড়ে নীচে বসে বললো—বোস বাবু। উপরে বোস তুই।

শৌভিক হেসে জায়গাটুকু গ্রহণ করে। বেশ লাগে এই পরিবেশ। এদের ভিতর কোন জটিলতা নেই। কোন মার প্যাঁচ নেই।

বাস ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাঁচি সহর পার হয়ে পাহাড়ে রাস্তায় এসে পড়ল। ভারি সুন্দর লাগে এই পথটি। কোন সময়ে দুধারে খাদ, মাঝখানে পথ। মনে হয় আকাশে উড়ে চলেছে। কোন সময়ে দুধারে খাড়াই পাহাড়, মাঝখানে পথ। এক এক সময়ে এঁকে বেঁকে চলে পাহাড়ে পথ দিয়ে। এদের ভাষায় এগুলোকে ঘাট বলে। এই রকম অনেকগুলো ঘাট পেরিয়ে গাড়ি চক্রধরপুর এলাকায় গিয়ে পড়বে।

—কোথায় যাবে তোমরা? শৌভিক জিজ্ঞাসা করে লোকটিকে।

—খুঁটিতে। লোকটির হাসিমাখা উত্তর। এদের মুখ থেকে কখনও হাসি শুকোতে দেখেনি শৌভিক। হাসি কি অরণ্যের সম্পদ? নগরের সভ্যতা কি সমস্ত হাসি শোষণ করে নিয়েছে?

—কোথায় গিয়েছিলে? শৌভিক ঘরোয়া হবার চেষ্টায় জিজ্ঞাসা করে।

—রাঁচিতে। গাছ কাটা হইছে। উখানে গিছলম। ছুটির পর বাড়ি ফিরছি। পাহাড়ীর বিনয়ী উত্তর।

বাস ঝাঁকানি দিয়ে চলছে। মাঝে মাঝে লরীর হেড লাইট এসে পড়ছে, তারপরই হুস করে পাশ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। লরী পার হওয়া দেখলেই শৌভিকের বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে। একবার যদি সামান্য একটু ছোঁয়া লাগে, তাহলে আর দেখতে হবে না।

গাড়ির ভিতরে সুর জেগে উঠেছে। পাহাড়ী সুরে কোল ছেলে-মেয়েরা গান আরম্ভ করে দিয়েছে।

কি গাইছে শৌভিক বুঝতে পারে না। গানের কলি বুঝবার উপায় নেই, তবু শৌভিকের ভাল লাগে। মিষ্টি সুরেলা আমেজে বাসের ভিতরটা ভরে উঠেছে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী যারা, তারাই গানে যোগ দিয়েছে। প্রবীণের দল মাথা নেড়ে তাল ঠুকে চলেছে। সবারই মুখে হাসি লেগে রয়েছে, আনন্দের ঝলকানি সবার চোখের তারায়।

এ পরিবেশ শৌভিকের একেবারে অচেনা। এর আগে অনেকবার বাসে করে চক্রধরপুর গিয়েছে, কিন্তু এত মিষ্টি গান আর সে শোনেনি। গানের তালে তালে কখন যে বাস খুঁটিতে এসে পৌছেচে, কেউ জানতেও পারেনি। হুঁস হল কণ্ডাক্টরের তাগাদায়।

—খুঁটি আ গিয়া। উতারো সব।

হুড়মুড়িয়ে সব কোল যাত্রী নেমে গেল বাস থেকে। ফাঁকা হয়ে গেল পুরো বাসটা। পিছনের দিকে যাত্রী কেবল শৌভিক; আর সামনের লেডিস্-কক্ষে এক বাঙালী ভদ্রমহিলা।

ভদ্রমহিলার পিছনটা দেখতে পাচ্ছে শৌভিক। পেছন থেকে শাড়ি-ব্লাউজ দেখেই আন্দাজ করছে বাঙালী বলে। হঠাৎ ভদ্রমহিলা মুখ ঘুরিয়ে পিছন ফিরলেন আর সঙ্গে সঙ্গে শৌভিক বোবা হয়ে গেল বিস্ময়ে।

সামনের সীটে বসে ট্রেনের সেই সুকেশা মহিলা।

—আপনি? শৌভিক সামনের দিকে এগিয়ে এসে কাছাকাছি বসল।

—প্রশ্নটা তো আপনাকেও করতে পারি। ভদ্রমহিলার গলায় একটু বিদ্রূপের ঝাঁঝ।

—আমার কথা ছেড়ে দিন। শৌভিক বললো—আমার ঘুরে বেড়ানোই কাজ।

—আমার আজ কলকাতায় ফিরে যেতেই হবে। মেয়েটির গলা থমথমে।

—কিন্তু এদিক দিয়ে যাচ্ছেন কেন?

—ট্রেন ফেল করলাম। বাসে চক্রধরপুর গিয়ে ওখান থেকে ট্রেন ধরে কলকাতায় চলে যাব।

বাস খুঁটি ছেড়ে চক্রধরপুরের দিকে চললো। দু ধারে ছোটনাগপুরের গভীর জঙ্গল। পথের দু পাশে শালগাছের দল আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে। একে রাত্রির কালো, তার সঙ্গে বনের কালো মিশে অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে তুলেছে। বনের ভিতর লক্ষ জোনাকি জ্বলছে। অন্ধকারের উপর রূপোর চাঁদোয়া খাটিয়েছে যেন।

পিছন দরজার কাছে কণ্ডাক্টর বসে। সামনে চালকের সীটে ড্রাইভার। মাঝখানে যাত্রী কেবল দুজন, একজন পুরুষ, অপরজন মহিলা।

—আপনি এ রাস্তায় গেছেন কখনও? শৌভিক নিস্তব্ধতাটা ভেঙে ফেলার জন্য জিজ্ঞেস করে। একঘেয়ে একটা যান্ত্রিক শব্দে হাঁপিয়ে উঠেছে শৌভিক। একটা বিরাম প্রয়োজন। বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনদিকে কোন শব্দ নেই। অন্ধকার যেন দুহাত বাড়িয়ে গলা টিপতে আসছে।

—একবার। ভদ্রমহিলা পিছন ফিরেই উত্তর দিলেন।

—এর আগে রাঁচিতে এসেছেন তাহলে?

শৌভিকের জিজ্ঞাসার কোন উত্তর এলো না। ভদ্রমহিলা বোধহয় বিরক্ত বোধ করছেন শৌভিকের অহেতুক কৌতূহলে।

—আপনার এ পথে আসতে ভয় করলো না?

—ভয়? ভদ্রমহিলা এবার মুখ ঘুরিয়ে বসলেন, যেন ফণা উঁচিয়েছেন।—কেন?

—এই পাহাড়ী পথে, এদের সঙ্গে যেতে ভয় করে না?

—না। মেয়েটির দৃপ্ত উত্তর—বরং আপনি না থাকলে আমি আরও নিরাপদ বোধ করতাম।

চমকে উঠলো শৌভিক।

তীব্র আলোর ঝলকানি চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে দিল। দু হাতে চোখ ঢাকা দিয়ে ফেললো শৌভিক। কি হল বুঝতে পারলো না। মনে হল বাসটা একদিকে কাৎ হয়ে মুখ গুজড়ে পড়েছে। ইঞ্জিন চলছে তখনো গোঁ গোঁ শব্দে। ড্রাইভার তারস্বরে কটূক্তি করছে পার হয়ে যাওয়া লরীটাকে।

—হেড লাইট্ মারকে লরী চালাতা হ্যায়। শা—

মেয়েটি উল্টে বাসের মধ্যে পড়ে গেছে। বেশ লেগেছে মনে হয়। মৃদু কাতরানি শৌভিকের কানে আসছে। পিছনের দরজা খুলে শৌভিক নেমে পড়ে রাস্তায়। কণ্ডাক্টর আগেই নেমেছে। তার ব্যাগ থেকে ছোট টর্চটা বের করে জ্বালতেই দেখলো বাসের সামনের বাঁ দিকের চাকা রাস্তার পাশের গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। মেয়েটি সীট থেকে ছিটকে মেঝের উপর পড়ে আছে।

—বেরিয়ে আসতে পারবেন? দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শৌভিক জিজ্ঞাসা করলো।

—উঠতে পাচ্ছি না। যন্ত্রণা মেশানো উত্তর শুনতে পেল শৌভিক।

তাড়াতাড়ি কণ্ডাক্টর আর ড্রাইভার ছুটে এলো। ইঞ্জিনের স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেছে। অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল মেয়েটির যন্ত্রণার শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। তিনজনে মিলে অনেক চেষ্টা করে দরজা খুলে মেয়েটিকে বাসের ভিতর থেকে টেনে বার করে নিয়ে এলো।

—কোথায় লেগেছে? শৌভিকের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ডাক্টরের হাতের টর্চ জ্বলে উঠল। মুখের উপর আলো পড়তেই চমকে উঠল

শৌভিক। কপালের উপর রক্তের দাগ।

—রক্ত! শৌভিক আতঙ্কিত হয়ে বললো, মেয়েটির হাত কপালের উপর থেকে ঘুরে এলো আর তার সঙ্গে খানিকটা রক্ত লেপে গেল।

তাড়াতাড়ি নিজের ব্যাগ খুলে খানিকটা টিনচার আয়োডিন বার করে শৌভিক তুলোয় ভিজিয়ে মেয়েটির হাতের সামনে তুলে ধরে বললো—ধরুন। লাগিয়ে নিন।

—দেখতে পাচ্ছি না, আপনি লাগিয়ে দিন।

—বিপদ হবে না তো? শৌভিক খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারল না।

—এখনও বিদ্রূপ? মেয়েটির গলা অসম্ভব রকমের করুণ শোনালো।

শৌভিক মেয়েটির কাটার ওপর আয়োডিনের প্রলেপ লাগিয়ে দিল। একটা যাতনায় অস্ফুট চীৎকার করে উঠল সে, জ্বলছে বড়।

—আর কোথাও লেগেছে? শৌভিকের দৃষ্টি মেয়েটির ক্ষত খুঁজে বেড়াতে লাগল।

মেয়েটি বাঁ হাতখানা এগিয়ে দিল। হাতে লেগেছে। সত্যিই আঙুলগুলো ছড়ে গেছে। আঙুলের ওপর আংটিটা চেপে বসে গেছে একেবারে। চাপের চোটে আঙুলের ডগা ফুলে উঠেছে।

—আংটিটা কেটে ফেলতে হবে। শৌভিক বললো।

মেয়েটি যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে বললো—যা খুসী করুন। যন্ত্রণায় আর থাকতে পারছি না।

—ড্রাইভার সাহেব প্লাস্ আছে? শৌভিকের জিজ্ঞাসা ড্রাইভার উদ্দেশ্যে।

—হ্যায় সাব, লে যাতা হ্যায়।

ড্রাইভারের প্লাস্ দিয়ে কোন রকমে আংটিটাকে দুভাগ করে, আঙুলটাকে উদ্ধার করা হল। তারপর আয়োডিনের ছোঁয়া দিয়ে রুমাল জড়িয়ে বেঁধে ফেললো শৌভিক।

—নিন মীনা দেবী, আপনার আংটি। আংটির টুকরোটা মীনা দেবীর হাতে দিয়ে শৌভিক বললো।

মীনা অবাক। শৌভিক তার নাম জানল কি করে? একদৃষ্টে সেই অন্ধকারের মধ্যে শৌভিকের দিকে তাকিয়ে মীনার পরম বিস্ময়। —আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

—হাতে লেখা ছিল।

মীনা হেসে ফেলে শৌভিকের কথার ধরণে। সত্যিই সে ভুলে গিয়েছিল আংটিতে তার নাম খোদাই করা আছে। একটু থেমে শৌভিকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—বাস আর চলবে না?

—জিজ্ঞাসা করছি। শৌভিক এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে গাড়ির বিষয় প্রশ্ন করল। কিছুটা দূরে একটা পাথরের ওপর ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টর পাশাপাশি বসে বিড়ি টানছে। শৌভিকের জিজ্ঞাসায় অত্যন্ত নির্বিকারভাবে জানাল, অ্যাক্সেল্ টুট্ গিয়া, যানা মুস্কিল হ্যায়।

—তাহলে?

—রাত পর্ ইধার রণে পড়েগা। সবিরমে কোই গাড়ি পাকাড়কে চলা যাইয়ে। ড্রাইভার যেন মুস্কিল আসান করে দিল।

—কিন্তু রাত কাটাবো কোথায়? শৌভিকের প্রশ্ন।

—এক কাম কিজিয়ে। টেবো হিল্‌স্ কা ডাকবাংলো ইধার হ্যায়। চলা যাইয়ে। কোই বাস্ আনেসে হামলোগ খবর ভেজেগা।

শৌভিক নীরবে ফিরে এসে মীনার পাশে দাঁড়ায়। দূর থেকে মীনা ওদের কথাবার্তার খানিকটা শুনতে পেয়েছিল, কাছে আসতে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি বললে?

—সারারাত পড়ে থাকতে হবে।

—এই বনের মধ্যে?

—কেন? আপনি তো বেশ নিরাপদেই থাকতে পারবেন। আমি চললাম।

—কোথায়?

—কাছেই একটা ডাকবাংলো আছে, সেখানে

—আমিও যাব।

—আমি থাকলে তো আপনার বিপদের আশঙ্কা।

—তা হোক, তবু যাব।

—লোকে যদি নিন্দে করে?

—করুক।

—বেশ, আসুন।

দুজনে ডাকবাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল। একটু দূরেই ডাকবাংলো। কণ্ডাক্টর পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। রাস্তা থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা টিলার ওপর টেবো হিলস্‌এর ডাকবাংলো। কণ্ডাক্টর বলে দিল—আপনারা ওখানে থাকুন, কোন বাস গেলে আমরা আপনাদের ডেকে দেবো। শৌভিক ধন্যবাদ দিয়ে অন্ধকার পাহাড়ী পথ দিয়ে মীনাকে নিয়ে বাংলোর দিকে চলল।

বাংলোর রক্ষককে ডেকে তুলতে শৌভিকের খুব কষ্ট হয়নি। বেশ পাতলা ঘুম। একবার ডাকতেই সাড়া দিয়ে উঠল। চোখ মুছতে মুছতে সামনে এসে অভিবাদন জানাল, ইয়েস সার, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

—ঘর খালি আছে? শৌভিক জিজ্ঞাসা করল।

—আছে, আসুন। লোকটি ওদের বারান্দায় নিয়ে গেল, তারপরে বলল, একটু দাঁড়ান, আলো আনছি।

পাশেই লোকটির ডেরা। আলো আনতে চলে গেল সে। শৌভিক একটা সিগারেট ধরাল। দেশলাইয়ের আলোতে আবছা ফুটে উঠল মীনার মুখ। তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

—ভয় করছে? শৌভিক জিজ্ঞাসা করল।

—না। মীনার উত্তর।

—এত সাহস আপনার হল কি করে?

মীনা কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আলো হাতে কেয়ার-টেকার এসে দাঁড়াল।—প্লিজ্‌ কাম্‌ ইন্‌।

দরজার তালা খুলে দিল লোকটি।—দিস্ রুম ইজ্ ফর ইউ সার।

ছোট গোছের ঘর। দু পাশে দুটো খাট। এক কোণে একটা ড্রেসিং টেবিল। মাঝখানে একটা টেবিল আর গোটা দুয়েক বেতের চেয়ার। ওপাশে একটা আরাম-কেদারা।

—তোমার নাম কি? শৌভিক কেয়ার-টেকারকে জিজ্ঞাসা করল।

—ডিসুজা।

—আর ঘর নেই? শৌভিকের অনুসন্ধান।

—নো সার। আদার রুম ইজ রিজার্ভড্ ফর ফরেস্ট্ অফিসার। আই ক্যান্‌নট্ ওপন্ দ্যাট।

—ঠিক আছে। এই ঘরেই চলে যাবে আজ। মীনা এতক্ষণে কথা বলল।

—থ্যাঙ্ক ইউ। আলোটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে ডিসুজা জবাব দিল—এনিথিং রিকোয়ার্ড। কল্ মি।

—মিঃ ডিসুজা। শৌভিক বললে—কিছু খাবার পাওয়া যাবে?

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে ডিসুজা জানাল—ওন্‌লি মিল্ক।

—এক গ্লাস গরম দুধ পাঠিয়ে দাও, আর যদি পার এক কাপ চা।

লোকটি মাথা নেড়ে মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল। মিশকালো গায়ের রঙ। বলিষ্ঠ চেহারা। দেখলে মনে হয় জাতিতে কোল ক্রিশ্চান।

—উঠুন, বিছানা করে দিই, শৌভিক নিজের স্যুটকেশ খুলতে খুলতে বলল।

—পাবেন কোথায়?

—আমার কাছে যা আছে, এক ব্যক্তির চলে যাবে। শৌভিক কম্বল আর চাদর বার করে খাটের উপর বিছিয়ে দিয়ে বলল—ব্যাস স্যুটকেশটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ুন।

—আপনি ?

শৌভিক ইজি-চেয়ারটা দরজার কাছে টেনে এনে বলল—আমি এটাতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব। কিন্তু এখন নয়, আগে লোকটি দুধ দিয়ে চলে যাক।

—কেন ?

—আমরা স্বামী-স্ত্রী নয় জানলে থাকতে দেবে না।

মীনা চুপ। কোন কথা নেই মুখে। ভালভাবে তাকাতেও পারছে না। কপালের কাছে যন্ত্রণাও হচ্ছে বেশ। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

—মিল্ক্ অ্যাণ্ড্ টি সার। ডিসুজা একটা ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে বলল—আই অ্যাম্ গোয়িং। গুড নাইট সার। গুড নাইট ম্যাডাম।

ডিসুজা যেমন অকস্মাৎ এসেছিল, তেমনি অকস্মাৎ মিলিয়ে গেল। শৌভিক দুধের গ্লাসটা মীনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—নিন, খেয়ে ফেলুন।

—আপনি ?

—আমার চা।

—ওতে হবে ?

—হবে। রিপ্রেজেন্টেটিভদের কোন কিছুতেই অসুবিধে হয় না।

মীনা আর কোন কথা না বলে এক চুমুকে দুধটা শেষ করে ফেলল। শৌভিক চায়ের কাপে চুমুক লাগিয়ে বলল—এবার শুয়ে পড়ুন। আমি দরজায় খিল লাগিয়ে দিচ্ছি।

—কেন ? দরজা বন্ধ করবেন কেন ? মীনার গলার স্বরে একটু যেন আতঙ্ক। একটু যেন অনিশ্চিত ভয়ের আভাস।

—কেন ? ভয় করছে ?

—তা করছে বই কি।

—বন্ধ না করলে যে আরও ভয়ের কথা।

—কিসের ভয়, সেইটেই জানতে চাচ্ছি।

—প্রথমতঃ সাপের। টেবো হিলস্‌এর সাপ ভীষণ। তারপর ভাল্লুকের। সবশেষে চোর ডাকাতের।

—ভয় দেখাচ্ছেন ?

—না। সত্য কথা বলছি।

—কিন্তু—।

বাধা দিয়ে শৌভিক বলল—বুঝতে পারছি আপনার বাধো বাধো ঠেকছে। বেশ, আপনি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন, আমি বারান্দায় ইজি-চেয়ারটা নিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি।

—না, না, সে কখনও হয় না। আপনিও ভিতরে থাকুন। মীনা পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। শৌভিক চেয়ারটাকে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে নিজের শোবার বন্দোবস্তো করে ফেলে, তারপর দরজা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরায়।

মীনা ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে কিছুই ঠাহর করতে পারল না। গাঢ় অন্ধকার ঘরের মধ্যে। আলোটা কখন নিবে গেছে, জানতেও পারেনি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো সে। অন্ধকারের ভিতর দৃষ্টি চালিয়ে কিছুই হদিস করতে পারল না মীনা।

—শুনছেন ? মীনা ডাকল।

—বলুন। ওপাশ থেকে জবাব এল।

যাক। ভদ্রলোক জেগে আছেন। একটা ভরসার নিশ্বাস ফেলল সে।

—জেগে আছেন ?

—কি মনে হয় ?

—আলোটা জ্বালেন নি কেন ?

—তেল নেই।

মীনা কিছুক্ষণ নীরব, তারপর জিজ্ঞাসা করল——কটা বাজে ?

—অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না।

—দরজাটা খুলে দিন। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

শৌভিক উঠে দরজা খুলে দিল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ভোরের আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। ভোর হয়ে গেছে। বনের মাথার ওপর উষা অভিনন্দন জানাচ্ছে ঘুমন্ত পৃথিবীকে।

পাখির কলকাকলীতে ভরে গেছে প্রভাতের অরণ্যমণ্ডলী। শাল-গাছগুলো মৃদু দুলছে, মনে হচ্ছে আলোর স্নানে মত্ত হয়ে আনন্দে মাথা নাড়ছে। মন ভরে আলোর আশীর্বাদ মাথায় গ্রহণ করছে।

—সকাল হয়ে গেছে। বারান্দায় বেরিয়ে শৌভিক জবাব দিল।

মীনাও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। ভোরের অরণ্য এর আগে দেখার সৌভাগ্য হয়নি তার। কি অপূর্ব! দিনের আলো যে এত মিষ্টি, এত স্নিগ্ধ হতে পারে, এ তার কল্পনার অতীত। শহরের যান্ত্রিক আলো আর নিষ্ঠুর কাজের মধ্যে এ সৌন্দর্যের মৃত্যু ঘটেছে। প্রকৃতির এ রূপ শহরে নেই।

—কি সুন্দর! মীনার মুখ থেকে আপনা হতেই কথাগুলো ঝরে পড়ল। শৌভিকের মুখে কোন কথা নেই। শুধু মীনার দিকে তাকাল। মীনার চোখেও স্বপ্ন। রাতের চোখে যে আতঙ্ক ছিল, তা কেটে গিয়ে ফুটে উঠেছে এক রঙীন স্বপ্নের রামধনু।

—বাবুজী! বাস আ গিয়া। কণ্ডাক্টরের আগমনে দুজনেরই হুঁস হয়। শৌভিক ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে—একটু দাঁড়াতে বল। আমরা যাচ্ছি। তারপরেই মীনার দিকে তাকিয়ে বলে—যান, বাথরুম থেকে চোখেমুখে একটু জল দিয়ে আসুন।

মীনা বিনাবাক্যে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। শৌভিক একটু গলা চড়িয়ে ডাকল—ডিসুজা!

নিজের ডেরা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ডিসুজা সাড়া দিল। কণ্ডাক্টর একটা কাগজের মোড়ক শৌভিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—এটা বাসে পড়েছিল। মোড়কটা নিয়ে খুলে দেখার সুযোগ পেল না শৌভিক। তাড়াতাড়ি কম্বল আর চাদরের ভাঁজের ভিতর জড়িয়ে

নিয়ে স্যুটকেশে পুরে গুছিয়ে ফেললো সব। ততক্ষণে ডিস্যুজা এসে দাঁড়িয়েছে।

—কত বিল ?

ডিস্যুজা টাকার অঙ্ক বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা দশটাকার নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বলল—বাকিটা বকসিস।

লম্বা সেলাম ঠুকে খুসী হয়ে স্যুটকেশ আর ব্যাগটা তুলে নিয়ে ডিস্যুজা বলল—চলুন বাসে তুলে দিচ্ছি।

মীনা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই শৌভিক তাড়া দিয়ে উঠল—চলুন তাড়াতাড়ি। এরপর বাস ফেল করতে হবে।

—চলুন। মীনা এগিয়ে যেতে যেতে জবাব দিল।

চক্রধরপুরগামী বাসে কণ্ডাক্টর উঠিয়ে দিল, এমন কি আর টিকিট কাটতেও দিল না। বলে দিল, গতরাতের টিকিটেই হবে। এরজন্য দায়ী বাস কোম্পানী। যাত্রীর তো কোন দোষ নেই।

বাস টেবো হিল্‌স্ ছেড়ে চলল।

এদের এই নিয়মটা শৌভিকের ভারি ভালো লাগে। একটা বাস মাঝপথে খারাপ হয়ে গেলে, পরের বাস তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে।

একটু পরেই পাহাড়ের রাজ্য ছাড়িয়ে সমতল ভূমিতে এসে পড়ল বাস। দু ধারে পাহাড়ের মাঝখানে খানিকটা উপত্যকা। এই উপত্যকার ওপর গড়ে উঠেছে চক্রধরপুর উপনিবেশ। উপনিবেশই বটে। বেশির ভাগ লোক রেলের কর্মচারী। রেল-কর্তৃপক্ষের একটা বিরাট ঘাঁটি চক্রধরপুর। এ ছাড়া আর সবাই ব্যবসায়ী। কেউ বিড়ি-পাতার ব্যবসা করে, কেউ বা সাবুই ঘাসের। দূর দুরান্ত থেকে লোকজন যাতায়াত করে ব্যবসার কেনা-বেচার জন্য। এক-পাশে পড়ে আছে অতীতের সাক্ষীর মত, রাজপ্রাসাদ। এককালে নাকি রাজা চক্রধরসিং প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি সিপাই বিদ্রোহের সময় কুমারসিংএর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে-

ছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজের রোষানলে চক্রধরসিংএর রাজত্ব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। সমস্ত এস্টেট বাজেয়াপ্ত হল। রাজা এবং তার বংশধরের জন্য কেবল একটা মাসোহারার ব্যবস্থা টিকে রইলো।

—চক্রধরপুর এসে গেছে। শৌভিক বলল—ওই যে রাজবাড়ি দেখা যাচ্ছে।

সত্যিই দূরে রাজবাড়ি দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ের কোলে রাজ-প্রাসাদ অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। সকালের রদ্দুর পড়ে আরও ঝলমল করছে রাজপ্রাসাদের রূপ। মীনার মনে হল সে যেন অকস্মাৎ শিবাজীর রাজ্যে চলে গেছে কোন মন্ত্রবলে।

বাস বাজারের ভিতর এসে দাঁড়াল।

—এবার আমায় নামতে হবে। শৌভিক বলল।

মীনা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল—আপনার পরিচয় পেলাম না।

—আমার নাম, শৌভিক মিত্র। পরের পরিচয় যদি কোনদিন দেখা হয় বলবো।

—নমস্কার। মীনা জোড়হাতে নমস্কার করে বললো—আমার পুরো নাম মীনাক্ষী সেন।

বাস ছেড়ে গেল স্টেশানের দিকে। শৌভিক চলন্ত বাসটার দিকে তাকিয়ে রইল যতক্ষণ দেখা যায়। মোড় ঘুরে চোখের আড়াল হয়ে যেতে শৌভিক একটা ছোট্ট নিশ্বাস ছাড়ল।

চক্রধরপুর বাজারের চৌমাথায় এসে শৌভিক একটু অবাক হয়ে গেল। অনেক বদলে গেছে। চৌমাথার ওপর একটা নতুন ফার্মেসী হয়েছে। বেশ বড় রকমের। তার ওপাশে তৈরি হয়েছে মস্তবড় রেস্টুরেন্ট। কলকাতার ফ্যাশানে। দোতলায় থাকবার বন্দোবস্তও আছে। বিরাট বড় অক্ষরে লেখা 'চক্রধরপুর রেস্টুরেন্ট অ্যাণ্ড বোর্ডিং'। তার তলায় বাংলায় লেখা, 'সুলভে থাকা ও খাবার সর-বরাহ করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

পরীক্ষা করবার জন্যই শৌভিক রেস্টুরেন্টের দিকে এগিয়ে গেল। দরজার কাছে যেতেই দোকানের মালিক জোড়হাতে অভ্যর্থনা জানালেন—আসতে আজ্ঞা হোক স্যার। আপনাদের সেবা করে এ জীবনকে ধন্য হতে দিন।

—কতদিন এ হোটেল খুলেছেন? এর আগের বারে দেখি নি তো? চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিল শৌভিক। নানা রকমের খদ্দেরের ভিড় একতলাতে।

—থাকবার জায়গা কোথায়?

—দোতলায়। দেখবেন স্যার, কি ভেন্টিলেশন। এয়ার কণ্ডি-শানকেও হার মানিয়ে দেয়। তারপরেই গলার স্বর চড়িয়ে হাঁক দেন —ওরে হরি, সাহেবের মাল-পত্তর দু-নম্বর কামরায় নিয়ে যা।—আসুন স্যার।

বিগলিত মালিক সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলে, পিছনে শৌভিক। হোটেলটা বেশ ভালই মনে হল শৌভিকের। ঝকঝকে, তকতকে।

—কেউ আছেন, না, সব খালি?

—কি বলছেন স্যার। ভদ্রলোক উত্তর দেন—পাঁচটা ঘরের মধ্যে তিনটে ফুল। দুটোতে পার্মানেন্ট বোর্ডার। কাঠের কোম্পানিতে কাজ করেন। আর একটিতে কাল থেকে এক দম্পতি এসেছেন। কলকাতায় থাকেন, বেড়াতে এসেছেন। দিনকয়েক থেকে চলে যাবেন।

দোতালায় উঠে শৌভিক খোঁজ নেয়—স্নানের ঘর কোথায়?

—সব অ্যাটাচড্ বাথ। একেবারে কলকাতার মত করেছি, যাতে আপনাদের একটুও কষ্ট না হয়।

—বেশ, তাহলে দুপুরের ভাতটা ঘরেই পাঠিয়ে দেবেন।

—বেশ, তাই হবে। একটা কথা স্যার। ক'দিন থাকবেন? আর নাম-ঠিকানাটা যদি দয়া করে—

—নিশ্চয়ই। বাধা দিয়ে শৌভিক বলে—খাতাটা পাঠিয়ে দিন। নাম-ধাম সব লিখে দিচ্ছি। সুটকেশ খুলে তেল-সাবান বের করে

শৌভিক। কলকাতা ছাড়ার পর ভাল করে স্নান করা হয় নি। মাথায় খানিকটা তেল ঘষে, তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে জিজ্ঞেস করে—আপনার পরিচয় পেলাম না তো।

—অধীনের নাম মহাদেব সামন্ত। নিবাস ডানকুনি গ্রামে। বেরিয়ে পড়েছিলাম ব্যবসার খাতিরে। অনেক জায়গা ঘুরে শেষে এইখানে এসে পড়েছিলাম ব্যবসার খাতিরে। অনেক জায়গা ঘুরে শেষে এইখানে এসে বাড়িটা কিনে ফেললাম। ব্যবসা আমাদের বংশগত। আমার ছোট ভায়ের দুটো হোটেল আছে পুরীতে।

—বেশ আলাপ হয়ে খুশি হলাম। শৌভিক স্নান করে যেতে যেতে বলে, আমি মাসে এক-আধবার আসবো। একটা করে ঘর আমার জন্য রাখবেন।

—নিশ্চয়ই স্যার। আমি তো আপনাদের সেবার জন্যই আছি। আর দেরি করবেন না। আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি চান সেরে নিন।

খাওয়া সেরে শৌভিক বেরোচ্ছিল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে। দরজায় তালা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই অবাক। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন সেই ভদ্রলোক, যাকে সে টাটানগরে দেখেছে।

—আপনি? বিস্মিত শৌভিকের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

—হ্যাঁ। শুকনো মুখে ভদ্রলোক বললেন—সীমাকে নিয়ে বড় মুশকিল হয়ে গেছে। কাল রাত থেকে সীমার জ্বর। একশো চারের ওপর মনে হচ্ছে। নতুন জায়গা, কাউকে চিনি না, কি করব, বুঝতে পারছি না।

—আপনারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

—কি করব বলুন? সীমার বাবা কিছুতেই আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন না।

—কিন্তু এ ভাবে কতদিন পালিয়ে বেড়াবেন? জানেন, আপনাদের পেছনে পুলিস ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—জানি, তাই টাটানগর থেকে গাড়ি ছাড়ার পর, সেদিন চাণ্ডিলে নেমে পড়ি। সেখান থেকে চক্রধরপুর পালিয়ে আসি। এখান থেকে ভেবেছিলাম বম্বে চলে যাব, কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেলাম সীমার জ্বর নিয়ে।

—চলুন আমার সঙ্গে। ডাক্তার চেনা আছে আমার।

—কিন্তু—ইতস্ততঃ করে দাঁড়িয়ে থাকেন ভদ্রলোক।—এই জ্বরে একা ফেলে রেখে যাই কি করে? আমি রইলাম, আপনি বরং এক জন ডাক্তার তাড়াতাড়ি ডেকে আনুন।

তাড়াতাড়ি নেমে যায় শৌভিক। পাশের ফার্মেসীতে উঁকি মেরে দেখল ডাক্তারের চেয়ার ফাঁকা। বোধহয় কোন কলে গেছেন। অপেক্ষা না করে ছুটল কালীবাড়ির দিকে। কালীবাড়ির কাছে ডাক্তার সান্যাল আছেন। বয়স হয়েছে এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ। এ তল্লাটে তাঁর নাম-ডাক আছে। কয়েকবারের যাতায়াতে শৌভিকের সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়ে গেছে।

ডাক্তার সান্যালের চেম্বারে ঢুকে দেখে যথারীতি ভিড়। শৌভিক ঢুকতেই, ডাক্তার সান্যাল মৃদু হেসে বললেন—বোস মিত্তির। এ রোগীগুলো দেখে, তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

—একটু তাড়াতাড়ি ছিল স্যার। শৌভিক কিন্তু কিন্তু করে বলে।

—রোগী ছেড়ে আমি তো রিপ্রেজেণ্টেটিভের সঙ্গে কথা বলতে পারব না। তাড়া থাকলে অন্য ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে এসো।

—সেজন্য আসিনি স্যার। শৌভিক ব্যাপারটা খুলে বলে—আমি যে হোটেলে উঠেছি, সেই হোটেলের একজন বাসিন্দা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

—তাহলে তো ভাববার কথা। ডাক্তারবাবু অন্য রোগীদের দিকে তাকিয়ে বলেন—তোমরা একটু বোস বাবারা। আমি এঁর সঙ্গে একটি রোগী দেখে এক্ষুনি আসছি।

সাইকেল-রিক্সা চেপে ডাক্তারবাবু আর শৌভিক হোটেলের সামনে

এসে অবাক। হোটেলের সামনে অনেক লোকের ভিড়। সকলের চোখে-মুখে উত্তেজনা।

—কি হয়েছে? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

—পুলিস ঢুকেছে হোটেলে। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন উত্তর দিল।

—সরো। ভিতরে যেতে দাও। ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে আশে-পাশের সকলকে সরিয়ে ভিতরে যাবার পথ করে নিলেন। হোটেলের ভিতরে আগে ডাক্তারবাবু, পেছনে শৌভিক চলল। সিঁড়ি থেকেই শৌভিক, মহাদেব সামন্তর গলা শুনতে পেল—আমি জানতাম না। আমার কোন অপরাধ নেই।

দোতলায় উঠে শৌভিক হতভম্ব। দারোগা তুজন পুলিশ সমেত দাঁড়িয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রাঁচির সেই ভদ্রলোক। এইবার পরিষ্কার সে চিনতে পেরেছে ভদ্রলোককে। মুরীতে এই ভদ্রলোককেই শৌভিক দেখেছে পুলিস ইনস্‌পেক্টরের পোষাকে। রাঁচিতে সাদা পোষাকে ঠিক চিনে উঠতে পারে নি।

—কি ব্যাপার? দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন ডাক্তার সান্যাল।

—এ কেস অফ্ ইলোপমেণ্ট। দারোগাবাবু জানান, তারপরে বলেন—মেয়েটার বড় জ্বর। এসেছেন ভালই হয়েছে, একবার দেখে দিন।

ডাক্তারবাবু ঘরের ভিতরে ঢোকেন, পিছু পিছু শৌভিকও। ডাক্তার সান্যাল পরীক্ষার পর রায় দিলেন—কালকেই এ জ্বর ছেড়ে যাবে, ভয় নেই।

—আজ কি এঁকে রিমুভ করতে পারব? দারোগাবাবু জানতে চান।

—তা পারেন। তবে ওষুধটা এক সপ্তাহ চালাবেন।

—বেশ, তাহলে একটা রিটেন পারমিশন দিন।

ডাক্তারবাবু খস খস করে প্রেসক্রিপশন লিখে দেন, তার সঙ্গে

নিয়ে যাবার অনুমতি দেন। শৌভিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, তার চোখের সামনে সীমা আর সেই ভদ্রলোককে পুলিস নিয়ে চলে গেল।

—আমার ভিজিটটা? ডাক্তারবাবু শৌভিককে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমিই দিচ্ছি স্যার। পকেট থেকে ভিজিটের টাকাটা ডাক্তার-বাবুর হাতে দিয়ে দেয়।

।। চার ।

সীমারা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল শৌভিক। মানুষ চরিত্রের কি বিচিত্র গতি। কাউকে বাইরে থেকে চেনার উপায় নেই। যাকে আপাত দৃষ্টিতে সুন্দর মনে হয়, চরিত্রের গভীরে ঢুকলে দেখা যায়, তার চেয়ে কুৎসিত কদাকার খুব কমই চোখে পড়েছে। ট্রেনে যখন সীমাকে দেখেছিল, কি মিষ্টিই না লেগেছিল শৌভিকের, অথচ আজ হোটেলের পরিবেশে মেয়েটির অন্যরূপ ফুটে উঠল। শৌভিকের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার মত হীন কাজ আর নেই। কেন পালাবে সমাজ থেকে? কি অপরাধ তাদের? ভালবাসা তো অন্যায় নয়। সমাজ বদলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সমাজের দৃষ্টিও বদলে যাচ্ছে, যাঁরা অতীতের তাঁরা এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে পারছেন না প্রাণপণ দিয়ে। আগের যুগের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আজকের সমাজের একটা সংঘর্ষ চলছে। এর শেষ হবেই একদিন। ততদিন অপেক্ষা করতে হবেই। কালের সঙ্গে আপোষ না করলেই সংঘর্ষ অনিবার্য আর সেই সঙ্গে আসে বিচ্যুতি। সমাজ থেকে বিচ্যুতি, সম্মান থেকে বিচ্যুতি। এভাবে ছুটে বেড়ানো এক রকমের অপরাধ।

মরুকগে যাক। পরের ব্যাপারে এত মাথা ঘামিয়ে কি হবে? কাজে বেরিয়ে পড়া যাক। সারা সকালটাই অকাজে কেটে গেল। এর পরে রোদ বেড়ে গেলে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। আর বেশি বেলায় ডাক্তারবাবুরাও ডিস্‌পেনসারীতে থাকেন না। হয় রোগী দেখতে বেরিয়ে পড়েন, নইলে বাড়িতে বিশ্রাম করেন।

ব্যাগ হাতে শৌভিক রাস্তায় নেমে পড়ে। চৌমাথার ওপর দাঁড়িয়ে একবার ভেবে নিল কোনদিকে যাবে। টাউনের হাসপাতালে যাবে না রেলের? রেলের হাসপাতালে গিয়ে কোন লাভ নেই। এখানের ডাক্তারের ওষুধ অর্ডার দেবার উপায় নেই; যা কিছু ওষুধ সব কলকাতার হেড অফিস থেকে আসে, এঁরা শুধু প্রেসক্রিপসন্ করার মালিক। তার চেয়ে টাউনের হাসপাতালে গেলে দু'চারটে ওষুধ লেখাতে পারবে, দরকার হলে কিছু মালেরও অর্ডার নিতে পারবে।

শৌভিক বড রাস্তা ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল রাণী হাসপাতালের দিকে। কোন এক অখ্যাত দিনে চক্রধরসিংহের বংশের কোন এক রাণী প্রজাদের চিকিৎসার জন্য স্থাপনা করেছিলেন এই হাসপাতাল। সেই রাণী আজ নেই, সেই চক্রধরসিংহও আজ বিস্মৃতির অন্তরালে, কিন্তু রাজপথের পাশে রাণীহাসপাতাল আজও তেমনিভাবে রয়েছে। বরং আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শৌভিক মনে মনে ভাবছিল, মানুষ চলে যায়, কিন্তু তার কীর্তি জগতে অক্ষয়, অমর হয়ে থাকে!

আউটডোরের ডাক্তার শুভেন্দু দত্ত রোগী দেখছিলেন একের পর এক। এর আগের বারেও শৌভিক দেখেছে এই ডাক্তারকে। একটু পরিচয়ও হয়ে গেছে এর মধ্যে। শৌভিকের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন—একটু বসুন, রোগীগুলো দেখে নিই আগে।

—আপনি কাজ সেরে নিন, আমি বসছি। শৌভিক কোণের বেঞ্চটা দখল করে বসে।

—ডাক্তারবাবু। ছেলেটার জ্বর যে ছাড়ছে না। একটি সাত-

আট বছরের ছেলেকে কোলে করে একটি ভদ্রলোক কাতর আবেদন জানায়।

—কই দেখি? ডাক্তারবাবু বললেন—শুইয়ে দাও ওই টেবিলের ওপর।

ছেলেটির বাবা তাই করল। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন, তারপর শৌভিকের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে তাকে ডাকলেন।

শৌভিক উঠে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল।

—স্যাম্পেল আছে?

—আছে। কি চান?

—একটা ভাল নিউট্রিসাস্ টনিক দিন তো।

শৌভিক ব্যাগ হাতড়ে একটা পুষ্টিকর ওষুধের বোতল বার করে ডাক্তারবাবুর সামনে তুলে ধরে। শুভেন্দুবাবু ছেলেটির বাবার হাতে ওষুধটা দিয়ে বললেন—এই ওষুধটা দুবেলা খাবার পর, দু'চামচ করে খাওয়াবে, আর ফুরিয়ে যাবার আগে এসে আবার নিয়ে যাবে।

—বেঁচে থাকুন ডাক্তারবাবু, আমার খোকার কি হয়েছে?

—খেতে না পাওয়ার জন্য এই জ্বর হচ্ছে। এর আসল চিকিৎসা হল দুবেলা পেট ভরে খাওয়ানো। পারবে? লোকটি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। একহাতে ছেলে, অন্য হাতে ওষুধ।

—কবে আবার আসবো?

—একদিন অন্তর এসে জানিয়ে যাবে, ছেলে কেমন থাকে।

—প্রণাম হই ডাক্তারবাবু। লোকটি প্রণাম করে ছেলেকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল।

—ওহে শোন। ডাক্তারবাবুর ডাকে ঘুরে দাঁড়াল লোকটি।

—কাছে এসো। ছেলেটিকে কোলে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

—ওই বাবুকে প্রণাম কর। হঠাৎ শৌভিককে দেখিয়ে দিয়ে ডাক্তার শুভেন্দু বললেন।

শৌভিক থতমত। একটু বিব্রতও।—আমায় কেন ?

—নিশ্চয়ই। শুভেন্দুর গলায় তখনও জড়তা—আপনিই তো সমস্যার সুরাহা করলেন। আমরা তো ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। দেখলাম, বললাম ওষুধ খাও গে। চুকে গেল। ওষুধ পাবে কোত্থেকে তার ঠিকানা নেই। আপনারা যদি স্যাম্পেল না দিতেন, তাহলে কবে এই সব রোগীর দল মরে ভূত হয়ে যেত।

শৌভিক বিস্মিত। তার চোখের সামনে ডাক্তারের এক নতুন রূপ ফুটে উঠল। এরা যন্ত্র নয়, এরাও মানুষ, এদের মনেও রোগীদের জন্য একটা অব্যক্ত ব্যথা সর্বদাই লেগে থাকে। কেউ সেটা প্রকাশ করে, কেউ করার সময় বা সুযোগ পায় না।

—আপনার মঙ্গল হোক বাবা। লোকটি ছেলেটিকে নিয়ে বিদায় নিল। ডাক্তার পরের রোগী দেখতে আরম্ভ করলেন। শৌভিক নীরবে বসে রইল। তার মনের ভিতর রোগাতুর ছেলেটির বাবার আশীর্বাদ ভেসে আসতে লাগল—আপনার মঙ্গল হোক বাবা।

তাহলে মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভের দলও সমাজ সেবা করে। তারাও মানুষের উপকারে আসে।

—সার, এবার আমি উঠবো। শৌভিক উঠে দাঁড়ায়।

—এরই মধ্যে ?

—আরও অনেক ডাক্তার ভিজিট করতে হবে। শৌভিকের সবিনয় নিবেদন।

—নিশ্চয়ই। আমি আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করে দিলাম।

—না, না, একি বলছেন ? আপনাদের সেবা করাই তো আমাদের কাজ।

—এটা বাড়াবাড়ি করলেন। ডাক্তার হেসে উত্তর দিলেন—নো সার্ভিস বাট্ এ ফ্রেণ্ডশিপ্। আপনারা হচ্ছেন সেতু। কোম্পানীর সঙ্গে আমাদের সংযোগ তৈরি করেন আপনারা।

—আশাকরি আমাদের সংযোগ অক্ষুন্ন থাকবে।

—সিওরলি। আপনি যে টনিক ওই ছেলেটিকে দিয়ে গেলেন, সে টনিকের নাম আমার মনে গেঁথে গেছে। দেখুন আমি কি অ্যামাউন্ট অফ্ বিজিনেস আপনার কোম্পানীকে দিই।

—ধন্যবাদ! চলি সার।

—নেক্সট্ টাইম এলে দেখা করবেন।

—নিশ্চয়ই।

শৌভিক আবার চক্রধরপুরের রাস্তায় এসে পড়ে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর এসে পড়েছিল শৌভিক। রেলের লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে কলোনীর মধ্যে চলে এসেছিল। রেল-কলোনীতে ঘোরা বৃথা। এখানে কোন ডাক্তারের হদিস পাওয়া যাবে না। বরং রাঁচি রোড ধরে হাঁটলে দু-একজন ডাক্তারের দেখা মিলতে পারে। অধিকাংশ চেম্বার রাঁচি রোডের পাশে।

দোকানের সাইন বোর্ডের দিকে তাকাতে তাকাতে শৌভিক এগোয়। বলা যায় না, নতুন কোন ডাক্তার চেম্বার খুলে বসেছেন কি না?

রাঁচি রোডের বড বাঁকটার কাছে এসে থেমে গেল শৌভিক। সুন্দর একটা নতুন ধরণের চেম্বার। সামনে কাঁচের সার্সি। তার ওপর ইংরিজী অক্ষরে আঁকা: মালহোত্রা ক্লিনিক।

কোন কথা না ভেবেই ঢুকে পড়ল শৌভিক। ঢুকেই বুঝতে পারল অসময়ে এসে পড়েছে সে। কোন পেশেন্ট নেই অপেক্ষা-ঘরে। একজন নার্স কেবল বসেছিল। শৌভিক ঢুকতেই নার্স দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল—ইয়েস্ প্লিজ্।

—মে আই মীট্ দি ডক্টর?

সিস্টার ইংরিজীতেই জানাল যে ডাক্তার নয়, লেডি ডাক্তার। কিন্তু তিনি কলে বেরিয়েছেন, ফিরতে অনেক দেরি হবে।

—কোথায় গেছেন?

—চয়নপুরে। এখান থেকে মাইল আষ্টেক দূরে।

একটু থেমে শৌভিক জিজ্ঞাসা করল—কতদিন ডাক্তার চেম্বার করেছেন ?

—একমাস।

—কি ধরণের প্র্যাকটিশ করেন তিনি ?

—মিড-ওয়াইফ্‌রি। শী ইজ এ স্পেশালিস্ট অফ্‌ গাইনী অ্যাণ্ড্‌ অবস্টেট্রিক্‌স্‌।

শৌভিক ব্যাগ থেকে বেছে বেছে আয়রণ প্রোডাক্ট আর ভিটামিন প্রোডাক্টস্‌-এর লিটারেচার বার করে তার সঙ্গে দুটো স্যাম্পেলও বার করে সিস্টারের হাতে দেয়।

—প্লিজ্‌, গিভ ইট টু হার। আই শ্যাল মীট হার নেক্সট্‌ টাইম।

—থ্যাঙ্কস্‌।

শৌভিক হোটেলের পথ ধরে। আর ঘুরতে ভাল লাগছে না। রোদ চড়ে গেছে ভীষণ। পাহাড়ী রোদে মাথা জ্বালা করছে। একটু হনহনিয়ে পা চালিয়ে দিল।

হোটেলে ঢুকতেই ম্যানেজার বললেন—খাবার পাঠিয়ে দেব সার ?

—দিন। দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোল শৌভিক। নিজের ঘরের তালা খুলে ঢুকে পডল। পাশের ঘরে তালা ঝুলছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। অসুস্থ মেয়েটি এখন পুলিসের জিম্মায়। কতদিন থাকতে হবে কে জানে ?

জামাকাপড় বদলে বাথরুম থেকে মুখ হাত পা ধুয়ে ফিরে এসে দেখে হোটেলের চাকর খাবারের থালা হাতে দাঁড়িয়ে, পিছনে ম্যানেজার।

—আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন ?

—কষ্ট কি বলছেন সার ? লম্বা জিব কেটে ম্যানেজার উত্তর দিলেন—আপনাদের সেবা করাই তো আমার ধর্ম। তারপরেই চাকরের দিকে তাকিয়ে তাড়া লাগালেন—দাঁড়িয়ে আছিস কেন হাঁ করে ? দেখছিস না উনি অপেক্ষা করছেন।

টেবিলের ওপর ভাতের থালা নামিয়ে দিল চাকরটি। ম্যানেজার আবার তাড়া লাগাল—যা শিগ্‌গীর। ভাল জল নিয়ে আয় আরও।

চাকরটি হুকুম তামিল করতে ছুটল।

ম্যানেজার শৌভিকের দিকে তাকিয়ে বিগলিত কণ্ঠে বললেন—আসুন সার, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। শৌভিক নীরবে ভাতের থালার সামনে বসে। বুঝতে পারে ম্যানেজার লোকটি পাকা ঝানু। কি করে লোককে বশ করতে হয়, এ তার নখদর্পণে।

—কদিন থাকবেন সার?

—এখনও ঠিক করিনি। খেতে খেতে শৌভিক জবাব দিল—ইচ্ছে আছে কালকের দিনটাও থাকবো।

—আচ্ছা সার, আপনি নিরিবিলিতে খান, আমি চলি। দরজা পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ম্যানেজার। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কটার সময় চা পাঠাবো?

ঘুম থেকে উঠে খবর দেব। শৌভিক উত্তর দিল—আজ একটু ভালভাবে ঘুমোব। কাল সারারাত একটুও বিশ্রাম করতে পারিনি।

ম্যানেজার বিদায় নিলেন। শৌভিক খাওয়া শেষ করে আঁচিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। বেশ লম্বা ধরণের গোটা দুয়েক আরামের টান দিল। এবার ঘুমোতে হবে।

বিছানার দিকে তাকাতেই চোখে ঘুম নেমে এল যেন। পৃথিবীর যতো ক্লান্তি সমস্ত যেন ভাত খাবার পর দেহের ওপর নেমে এল। বেশ লম্বা রকমের একটা ঘুমের একান্ত প্রয়োজন।

সুটকেশ খুলে ফেলল শৌভিক। হোটেলের বিছানার ওপর নিজের চাদর বিছিয়ে নিলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। এর আগেও যেখানে হোটেলে শুয়েছে, ওই একই ভাবে চাদর পেতে নিয়েছে।

চাদরের বাণ্ডিল খুলেই শৌভিক অবাক।

খবরের কাগজের মোড়কটা গড়িয়ে পড়ল বিছানার ওপর। এতক্ষণে মনে পড়ল, টেবো হিল্‌স্‌-এর ডাকবাংলোয় আসার সময় কণ্ডাক্টর দিয়েছিল।

বিছানায় বসে মোড়কটা খুলে ফেলল।

একটা চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ। হাতলটা ছিঁড়ে গেছে। ব্যাগের ওপর নাম লেখার জায়গায় ইংরিজী অক্ষরে লেখা রয়েছে: মীনাক্ষী সেন।

তার তলায় বাড়ির ঠিকানা।

কি করবে সে ব্যাগটা নিয়ে? ভদ্রমহিলাকে ফেরৎ দিয়ে দেওয়া উচিত। খুলবে? খুলে দেখবে কি আছে ভিতরে?

ভাবতে ভাবতে খুলেই ফেলল শৌভিক। একি! ভিতরে এক-গোছা একশো টাকার নোট, তার সঙ্গে গোটাকয়েক ভাঁজ করা কাগজ।

আবার বন্ধ করে ফেলল ব্যাগটা।

ব্যাগটা ফেরৎ দিয়ে দেওয়া দরকার। হয়ত রাঁচি থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল কলকাতায় জরুরী কোন দরকারে। বাসের মধ্যে অ্যাক্-সিডেণ্টের সময় নিশ্চয়ই ছিটকে পড়েছিল ব্যাগটা। কণ্ডাক্টর দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শৌভিক একদম ভুলে গিয়েছে। অর্থের অভাবে হয়ত ভদ্রমহিলা ভীষণ বিপন্না। যে করেই হোক ব্যাগটা তার হাতে পৌঁছে দেওয়া দরকার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আজই কলকাতা ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।

বিকেল বেলায় শৌভিক জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচে নেমে এল। ম্যানেজার বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—একি! কোথায় চললেন?

—কলকাতায়। ভীষণ প্রয়োজন।

—কিন্তু আমি যে কাল অবধি আপনার নামে ঘর বুক করে রেখেছি।

—বেশ। কালকের ভাড়াটাও কেটে নিন। শৌভিক কাউণ্টারের ওপর টাকা রেখে বলল।

বিগলিত ম্যানেজার টাকার রসিদ দিয়ে বললেন, গরীবকে মনে রাখবেন সার। এলে এখানেই উঠবেন। একেবারে কলকাতার মত—।

নমস্কার করে শৌভিক রাস্তায় নামে। সামনের সাইকেল রিক্সার উপর চেপে বলল—স্টেশন চলো। জলদি।

স্টেশনে এসে শুনলো প্যাসেঞ্জার ট্রেন রাইট টাইমে আসছে। কাল ভোর বেলায় হাওড়ায় পৌঁছুবে। কোনদিকে না ভেবে শৌভিক কলকাতার একটা টিকিট কেটে, ফিরে এসে রেস্টুরেণ্টে বসল। হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, গাড়ি আসতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি।

শৌভিকের মনে কেবল একটি কথাই উঁকি মারতে লাগল, কখন কালকাতায় পৌঁছুবে ? কখন মীনাক্ষীর হাতে তুলে দেবে তার ভ্যানিটি ব্যাগ, আর ভিতরের সঞ্চিত অর্থ ?

॥ পাঁচ ॥

কলকাতার বাড়িতে ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গেল। এবারের টুরে বিজিনেস বেশ ভালই হয়েছে। বেশ কিছুটা কমিশন পাওয়া যাবে, মনে হয়।

—কার ধ্যান করছো ? চা-জল-খাবার হাতে বউদি ঘরে ঢুকলেন।

—ধ্যান করছি বলে মনে হচ্ছে ? শৌভিক চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করল।

—নিশ্চয়ই। ওই রকম ঢুলু ঢুলু চোখে একমাত্র স্বপ্ন দেখাই সম্ভব।

—দূর! চায়ে চুমুক দেয় শৌভিক—তোমার যত সব বাজে কথা।

—না, মশাই। মোটেই বাজে কথা নয়। বউদি দেওরের পাশে জাঁকিয়ে বসে জিজ্ঞেস করল—তোমার মীনাক্ষী কেমন দেখতে বলো না ?

—একদম বাজে। মাছের চোখের মত কুতকুতে ছোট চোখ। তাতে না আছে ইসারা, না আছে ভরসা।

—তার মানে তুমি মরেছো।

জলজ্যান্ত মানুষটাকে তুমি মেরে ফেলছো? আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়েছেলে।

—মানুষ দু রকম মরে। এক দেহে আর এক মনে। তুমি মনে মরেছো।

—দাদা বুঝি আজকাল খুব নাটক-নভেল পড়াচ্ছে?

—অর্থ? বউদির চোখে ঠাট্টার কটাক্ষ।

—নইলে এত ভাল ভাল কথা শিখলে কোত্থেকে?

—এসব কথা বইতে লেখা থাকে না, লেখা থাকে সংসারের পাতায়, বুঝলেন মশাই। যাকগে, ওসব কথা আমার ভাবলে চলবে না। উনুনে ডাল চড়িয়ে এসেছি, ধরে যাবে। আমি চললাম, আপনি মীনাক্ষীর ধ্যান করুন।

বউদির প্রস্থান। শৌভিক প্রস্তুত হয়ে নেয়, অফিসে যাবার জন্যে। অফিসে রিপোর্ট দিতে হবে। সে যে কলকাতায় উপস্থিত, এ সংবাদ না দিলে কর্তৃপক্ষের ভ্রূকুটি দেখতে হবে, মিঠেকড়া কয়েকটা কথা শুনতে হবে।

কাগজপত্র ঠিক করতে গিয়ে মীনাক্ষীর ব্যাগটা বেরিয়ে পড়ল। তুলে ধরল শৌভিক ঠিকানাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নেবার জন্যে। স্পষ্টাক্ষরে লেখা: মীনাক্ষী সেন। তারপরেই তার বাড়ির ঠিকানা।

মীনাক্ষী। নামটা কেমন যেন মনে গেঁথে গেছে শৌভিকের। এক এক সময়ে ভারী আশ্চর্য লাগে শৌভিকের। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন কেমন হঠাৎ, কোথা থেকে কি ভাবে হয়, কেউ বলতে পারে না। কোথায় ছিল শৌভিক, আর কোথায় মীনাক্ষী। কি ভাবে উভয়ে কাছাকাছি এসে দাঁড়াল, দুজনের কেউই জানে না।

—অফিস যাবে না? বউদির তাড়ায় শৌভিকের চমক ভাঙে। ব্যাগ লুকোবার উপায় নেই। একেবারে বামালশুদ্ধ গ্রেপ্তার।

—কি গো? বউদির চোখেমুখে হাসি উপছে ওঠে—আজকাল বুঝি এই রকম ব্যাগ দিচ্ছে অফিস থেকে?

—ব্যাগটা ফেলে গেছে মীনাক্ষী। ভাবছি অফিস-ফেরতা দিয়ে আসবো। ভ্যানিটি ব্যাগটা নিজের ওষুধের ব্যাগে ভরতে ভরতে শৌভিক জবাব দিল।

—ফেলে গেছে, না রেখে গেছে?

—সত্যিই ফেলে গেছে। শৌভিকের গলায় কৈফিয়তের সুর।

—অত সাফাই গাইতে হবে না। সোজা বললেই হয়, দেখা করতে যাব।

—বেশ। দেখা করতেই যাবো। হল তো? শৌভিক জামা-কাপড় বদলাবার তাগিদে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অফিসে ঢুকতে শৌভিকের একটু দেরি হয়ে গেল।

তরতরিয়ে সিঁড়িগুলো পেরিয়ে সেল্‌স্ ডিপার্টমেণ্টে যখন পৌঁছুল, তখন অন্য সব মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভ কাজ বুঝে চলে গেছে। সে কাঁচের দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই সেল্‌স্ ম্যানেজার গম্ভীর হয়ে বললেন, সময় হলো এতক্ষণে।

—একটু দেরি হয়ে গেছে স্যার। বিনীত কৈফিয়ৎ শৌভিকের।

সেল্‌স্ ম্যানেজারের মুখে ঝড়ের পূর্বাভাষ। থমথমে গলায় জানিয়ে দেন—জেনারেল ম্যানেজার ডেকেছেন তোমায়।

শৌভিকের মুখ শুকিয়ে গেল। এ ডাকার অর্থ সে বোঝে। হয় চার্জশীট, নইলে ডিসচার্জ লেটার। রিপ্রেজেণ্টেটিভের চাকরির এই মজা। পান থেকে চুন খসলেই সর্বনাশ।

—কেন স্যার? শৌভিকের ভয়ার্ত জিজ্ঞাসা।

—সে কথা তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারবে।

—কখন দেখা করতে বলেছেন?

—এলেই বলেছেন।

জেনারেল ম্যানেজারের কামরার সামনে এসে দাঁড়ায় শৌভিক।

দরজা বন্ধ। দরজার মাথায় লেখা 'এনগেজড'। ভিতরে কেউ আছে, তারই সঙ্কেত। বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। ভিজিটিং রুমের একটা চেয়ার দখল করে বসে পড়ে সে। মনে মনে ভাবে কি অন্যায় সে করেছে? এবারের টুরে বরং বিজনেস বেড়েছে আরও। তাহলে? সীমার পালানোর ব্যাপারে পুলিস কি কিছু জানিয়েছে?

এনগেজড সরে গিয়ে 'ফ্রি' বেরিয়ে এলো বোর্ডের ভিতর। জেনারেল ম্যানেজার খালি হয়ে গেছেন।

শৌভিক স্লিপে নাম লিখে পাঠিয়ে দিয়ে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করে। কি নির্দেশ আসে কে জানে?

ডাক এলো। ভিতরে ঢুকে জেনারেল ম্যানেজারকে নমস্কার করে দাঁড়ায়। তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে জেনারেল ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন—শৌভিক মিত্র ইজ ইয়োর নেম?

—ইয়েস্ স্যার।

—একটা দুঃখের কথা জানাচ্ছি। জেনারেল ম্যানেজার গলাটাকে যতটা সম্ভব করুণ করে বলেন—বড় সাহেবের একটা অর্ডার আছে।

শৌভিক চুপ। আসন্ন দুর্যোগের সম্ভাবনা ঘরময়। এমন কি জেনারেল ম্যানেজারের গলার স্বরেও।

—আপনি জামসেদপুরে ডাক্তার মজুমদারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তিনি আপনার নামে বড় সাহেবের কাছে কমপ্লেন করেছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে যা-তা ব্যবহার করেছেন।

—আমি তো কিছু করি নি। বরং তিনিই দুর্ব্যবহার করেছেন। আমাদের ওষুধ সিরিঞ্জে ভরে আমাকেই দিতে আসছিলেন।

—ইনজেকশন নিতেন। আপনি নিলে ডাক্তারের বিশ্বাস হত। রিপ্রেজেণ্টেটিভের চাকরি এত সোজা নয়।

শৌভিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

জেনারেল ম্যানেজার নির্বিকারভাবে জানিয়ে দেন, যে রিপ্রেজেণ্টে-

টিভের নামে ডাক্তার খারাপ রিপোর্ট করেন, সে লোককে কোন কোম্পানি রাখতে পারে না। আপনি ভাল বিজিনেস দিয়েছেন, তার জন্যে বড় সাহেব নিজের হাতে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

সার্টিফিকেটটা শৌভিকের দিকে এগিয়ে দেন জেনারেল ম্যানেজার। একটুখানি চুপ থাকার পর জেনারেল ম্যানেজার আবার বললেন—তার সঙ্গে বড় সাহেব এই চিঠিটাও দিয়েছেন। আপনার চাকরির ডিসচার্জ নোটিশ। কারণ, ইল্ বিহেভিয়ার উইথ দি ডক্টর।

সে চিঠিখানাও নীরবে হাতে নেয় শৌভিক। সহসা কোন কথা জোগায় না মুখে। বাড়িতে বউদি, দাদা, মা বসে আছেন, তারই অর্থের আশায়। টাকা না পেলে উপোস করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবে না।

—অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে আপনার দেনাপাওনা বুঝে নিন। ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিনাবাক্যে শৌভিক জেনারেল ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। একবার নিজের মনেই হাসি আসে তার। এই তো জীবন ভাঁড়ের। আজ রাজা, কাল ফকির।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর মীনাক্ষীর বাড়ির সামনে যখন শৌভিক হাজির হল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। দুপুর বেলার যেটুকু বাকি ছিল অফিসের দেনা পাওনাতেই কেটেছে। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে অ্যাকাউন্ট্যাণ্টের সামনে তীর্থের কাকের মত বসে থাকতে হয়েছে ঘণ্টা কয়েক। ভারি বিরক্ত লাগছিল শৌভিকের, রাগও হচ্ছিল মনে মনে। তার নিজের প্রাপ্য টাকাই যেন দয়ার দান বলে দিচ্ছিলেন অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট মশাই। শীর্ণকায় কৃষ্ণবর্ণ ভদ্রলোকের মুখ থেকে অনবরত মিশ্রীর ঝর্ণা গড়াচ্ছে। মাঝে অকারণে শৌভিকের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন—এই, দিলাম বলে। আর দেরি নেই।

দেরি নেই, দেরি নেই করতে করতে ঘড়ির কাঁটা চারটের ঘরে এসে দাঁড়াল। অসহিষ্ণু শৌভিক তীক্ষ্ণ রুক্ষতায় বলল—কি মশাই ?

টাকা তৈরি হল ?

—আজ তো সন্ধ্যে হয়ে গেল। কাল নিয়ে যাবেন।

হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে শৌভিক তারপর উগ্র মেজাজে বলে—কাল আসবো কেন ?

—টাকাটা নেবার জন্য। কয়েকটা কাগজে সই করতে করতে অ্যাকাউন্ট্যান্ট মশাই বললেন।

—কাল, তাহলে আপনি বেরোবেন, আমার চাকরির সন্ধানে।

—যা টাকা পাচ্ছেন, মাস কয়েক তো নিশ্চিন্ত।

—আমার অবস্থা তো এখন আপনি বুঝবেন না। আগে আপনার চাকরি যাক, তখন মালুম হবে কত ধানে কত চাল ?

—এ আবার কি বলছেন ? পাংশু মুখে জবাব দিলেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট মশাই—আমার চাকরি যাবে কোন দুঃখে ?

—কোম্পানির জন্য ভালভাবে কাজ করছেন বলে।

শৌভিকের কথা শুনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট এর আক্কেল গুড়ুম। ভয়ে ভয়ে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেন। কেউ শুনে ফেলেছে কি না, কে জানে ? এই কথাবার্তা অতিরঞ্জিত হয়ে বড় সাহেবের কাছে কী রূপ নেবে কেউ বলতে পারে না। পাগলা মহম্মদ তোগলকের সংস্করণ সাহেব হয়ত শুনেই কোতল করে দেবেন, বিচারের অপেক্ষা করবার মত তাঁর ধৈর্য নেই।

তাড়াতাড়ি ক্যাশ ভাউচারে সই করে শৌভিকের হাতে দিয়ে বললেন—ক্যাশে গিয়ে বুঝে নিন।

নিজের মনেই হেসে শৌভিক গিয়ে দাঁড়াল ক্যাশিয়ারের কাউন্টারে।

আর এক জীব এই ক্যাশিয়ার। বিস্তীর্ণ টাকের উপর সর্বদা হাত বুলোচ্ছেন, আর তাড়ি তাড়ি নোটের টাকা গুণে চলেছেন। ঠোঁটের কোণে আধপোড়া কোহিনুর বিড়ি সব সময়ে গোঁজা। কাউকে সামনে দেখলেই খেঁকিয়ে ওঠেন আচমকা। শৌভিক কাউন্টারের কাছে গিয়ে ভাউচার এগিয়ে দিতেই ক্যাশিয়ার খিঁচিয়ে উঠলেন বেমক্কা—

এই যে লুচিভাজা হাতে করে এলেন জামাইবাবু।

শৌভিক নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের সঙ্গে কথা বলারও প্রবৃত্তি তার নেই। কোন রকমে টাকাটা নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে।

—কই দেখি ভাউচার। কোহিনূর বিড়ির সঙ্গে কথাটা বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

শৌভিক ভাউচারের কাগজ এগিয়ে দেয় ক্যাশ-কাউন্টারে।—নিন, সই করুন। উল্টোদিকটা শৌভিকের সামনে ফেলে দিয়ে বললেন। শৌভিক নীরবে সই করে দাঁড়িয়ে থাকে। টাকা গুণে হাতে গুঁজে দিয়ে ক্যাশিয়ার বললেন, কটা ছেলে মেয়ে ?

—বিয়ে হয়নি।

—তাহলে বেঁচে গেছেন। মাস কয়েকের মধ্যেই ভাল কোথাও কাজ জুটিয়ে নিন।

—ধন্যবাদ।

শৌভিক রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

কড়া নাড়তে মীনাক্ষী বেরিয়ে এসে অবাক—আরে, আপনি ? আসুন ভেতরে।

শৌভিক ভিতরে ঢোকে মীনাক্ষীর পিছু পিছু।

—কবে কলকাতায় এলেন ? মীনাক্ষীর প্রশ্ন।

—আজ সকালে। শৌভিক জবাব দেয়, তারপর ভ্যানিটি ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বলে—আপনার ব্যাগটা।

মীনার চোখেমুখে হাসি ঝলসে ওঠে। আনন্দ-ব্যাকুল কণ্ঠে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে—আপনি পেলেন কোথায় ?

—ফেলে এসেছিলেন টেবো হিলস্‌-এ।

—ঘরে চলুন। মীনাক্ষী অভ্যর্থনা জানায়।

—আজ থাক। একটু থেমে শৌভিক বলে—আর একদিন আসব।

—কেন ? উঠোনের চারিদিকে তাকিয়ে মীনাক্ষী হেসে বলল—ঘরে ঢুকতে লজ্জা পাচ্ছেন, নোংরা দেখে ?

—না। শৌভিকের একটু গম্ভীর উত্তর, আমিও মধ্যবিত্ত।

—তবে আর বাধা কী ? ভিতরে আসুন।

মীনাক্ষীর পিছনে শৌভিক ঘরের ভিতর ঢুকল। মোড়াটা এগিয়ে দিয়ে শৌভিককে বসতে বলে মীনাক্ষী একটু জোর গলায় ডাকলো—কাদম্বিনী।

—বাবুর জন্যে এক কাপ চা করে দে।

—আজ থাক। শৌভিক উঠে দাঁড়ায়—আর একদিন এসে খেয়ে যাব।

—বসুন না। যাবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ? মা বেড়াতে গেছেন পাশের বাড়ি, একটু পরেই এসে পড়বেন। আলাপ করিয়ে দিলে, দেখবেন কত ভাল তিনি।

—আজ এসেছিলাম শুধু ব্যাগটা দিতে। আর একদিন এসে আলাপ করে যাব।

—ব্যাগটা পেয়ে সত্যিই আমার খুব উপকার হল। জানেন কি আছে ভিতরে ?

—আমার তো জানার কথা নয়। মৃদু হেসে শৌভিক জবাব দিল। একটু থেমে মীনাক্ষী বলল—পাঁচ শো টাকা আছে এর ভিতর। হারিয়ে গিয়ে পাগলের মত অবস্থা হয়েছিল।

—খুলে দেখুন আছে কি না ?

মীনাক্ষী চোখ তুলে একবার শৌভিকের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টিতে অনেক কথার ছায়া। অনেক ভাষার ঢেউ সে চাউনির মধ্যে। এত কথা গুমরে উঠল, অথচ শুধু বেরিয়ে এল—ছিঃ। আপনাকে অবিশ্বাস করব ?

—ব্যাগটা আমায় বাস কণ্ডাক্টর দিয়েছিল।

মীনাক্ষী খুলে দেখল টাকা ঠিকই আছে। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল—না সব ঠিক আছে।

—যাদের আমরা খারাপ ভাবি, আসলে তারা খারাপ নয়। শৌভিকের উত্তর, তারপরেই দাঁড়িয়ে উঠে বলল—আর নয়, এবার চলি।

—এত চলি চলি করছেন কেন বলুন তো ?

—বাড়িতে একটা শুভ সংবাদ দিতে হবে।

—সে খবটা কি আমি শুনতে পারি না ?

—সকলের ভাগ্যে শুভ-সংবাদ সহ্য হয় না।

—শুনিই না।

শৌভিক একটু চুপ করে দাঁড়াল, তারপর গম্ভীর হয়ে বলল—আমার চাকরি গেছে।

মীনাক্ষী স্তব্ধ। শৌভিক আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে শুধু বলল—আজ চললাম মীনা দেবী। আবার দেখা হবে।

শৌভিক বেরিয়ে গেল।

মীনাক্ষী একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কোনদিকে তার খেয়াল নেই, শুধু ভাবল—এ লোক তো ভারি অদ্ভুত! হাসতে হাসতে অশুভ সংবাদ বলতে পারে অনায়াসে।

॥ ছয় ॥

শৌভিক বাড়িতে ঢুকে প্রথমে দুঃসংবাদটা বউদিকে দিল। আশ্চর্য লাগে বউদিকে শৌভিকের। এত বড একটা খবর, বউদির মুখে তার কোন চিহ্ন নেই। হেসে উত্তর দিল—চাকরি গেছে, আবার হবে। মীনাক্ষী চলে যায় নি তো ?

—না। পকেট থেকে পাওনা টাকার গোছা বউদির হাতে তুলে দিয়ে শৌভিক জবাব দিল—তাকেও খবরটা দিয়েছি।

—তবে আর কি! বউদির তরল ঠাট্টা—মনের মানুষ তো পেয়ে

গেছো এবার। বউদিকে না হলেও চলে যাবে মনে হয়।

শৌভিক গম্ভীর হয়ে বিছানার ওপর বসে পড়ে? ভবিষ্যতের চিন্তা, তাকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। দাদার যা মাইনে, তাতে সংসারের খরচ চলা অসম্ভব। শৌভিকের মাইনের টাকা যদি হাতে এসে না পড়ত, তাহলে কাবুলীওয়ালার দরজায় ধর্ণা দিতে হত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

—কি গো, সাড়া দিচ্ছ না কেন? বউদির টিপ্পনী—একেবারে স্বপ্নে বিভোর যে।

—কি বলবো? শৌভিকের অস্বস্তি—তুমি বুঝতে পারছো না, আমার অবস্থা।

—বুঝছি না আবার। হেসে উঠল বউদি।—এক কাজ কর। ঠিকানাটা দাও, বরণ করে নিয়ে আসি।

শৌভিক উঠে পড়ে। বউদির কোন কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান নেই। আজকের এই দুর্দিনে চাকরি যাওয়ার পরও কোন ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে, এ ধারণা শৌভিকের মাথায় আসে না।

—আবার চললে কোথায়? বউদি এবার গম্ভীর।—বোস, চা নিয়ে আসি।

—কি হবে বউদি, চাকরি তো গেল, সংসার চলবে কি করে?

—যা টাকা এনেছো, মাস তিনেক চালিয়ে দেবো। তার ভিতরে কোথাও একটা কাজ জুটে যাবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু তিনমাস পরে শৌভিকের সঙ্গে সঙ্গে বউদিও ভেঙ্গে পড়ল। শৌভিকের কোথাও চাকরি হল না। কয়েকটা জায়গা থেকে ইণ্টার-ভিউ এসেছিল সত্য, কিন্তু নিয়োগপত্র আসেনি কোন জায়গা থেকেই। সঞ্চিত অর্থ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে গেল, প্রদীপের তেলের মত। কৌশিকের সামান্য আয়ে সংসার আর চলে না। বউদির মুখের হাসিও শুকিয়ে এল ধীরে ধীরে। কৌশিক আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর। মা উঠতে বসতে গঞ্জনা দেন,—এত বড় ছেলে। কোন কম্মের নয়।

সকাল বেলায় দাদার সঙ্গে খেয়ে বেরিয়ে পড়ে শৌভিক চাকরির প্রত্যাশায় কলকাতার রাজপথে। এর আগেও কলকাতার রাস্তায় সে ঘুরেছে, কিন্তু পায়ের নিচের পিচ এত কঠিন মনে হয়নি কোনদিন। সূর্যের তাপ যেন আগের চেয়ে বেড়েছে। মাথা জ্বালা করে উঠছে রদ্দুরে। কোথাও একটু ছায়া পেলে দাঁড়িয়ে যেত।

নিজের মনেই হেসে ফেলে শৌভিক। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ্ হয়ে যখন ঘুরছিল, তখন এই রোদই কত ভাল লেগেছে, কত উত্তেজনা দিয়েছে। আজ যেন রদ্দুরের ঝাঁঝে অবসাদ এনে দিচ্ছে।

ডালহাউসির দিকে একবার তাকিয়ে দেখল শৌভিক। ছোট্ট একটা নিশ্বাস বেবিয়ে আসে আপনা থেকেই। আকাশস্পর্শী প্রাসাদের খোপে খোপে অজস্র লোক নিজের কাজে তন্ময় হয়ে আছে। ওর ভিতর একটি চেয়ারও কি শূন্য নেই? একজন লোককেও কি চাকরি দেবার কোন উপায় নেই?

একটা অফিসের সামনে এসে দাঁড়ায় শৌভিক। কাঠের দরজা ঠেলে ঢোকার ইচ্ছে হয়েছিল তার, কিন্তু বাঁ দিকে নজর পড়তেই পা দুটো পিচের সঙ্গে জুড়ে গেল। বড বড ইংরিজী হরফে স্পষ্ট লেখা, 'নো-ভেকেন্সি'। লেখাটার দিকে দুবার তাকাল সে। লাল মোটা অক্ষরগুলো যেন ওকে বিদ্রূপ করছে। যেন মৃদু মৃদু হাসছে।

জোরপায়ে শৌভিক অন্যদিকে চলে গেল। পিছনে তাকাবার সাহস নেই তার। তাকালেই দেখবে লাল কালির অক্ষরগুলো দাঁত বের করে হাসছে। সে হাসি অসহ্য।

ঘুরতে ঘুরতে শৌভিক আর একটা অফিসে ঢুকে পড়ল। সামনেই বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল। শৌভিককে দেখে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। শৌভিক একটু চুপ করে থেকে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—সাহেব আছেন?

—আছেন। বেয়ারা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মুখে একটু সমীহ মেশানো। সাহেবের নাম করে এসেছেন। কে জানে, হয়ত

আত্মীয়-স্বজন কেউ হবে।

—দেখা করবো। শৌভিকের উত্তর। সে মরিয়া হয়ে গেছে। দরখাস্ত করে আর কিছু হবে না, সরাসরি দেখা করে দেখবে কি হয়।

স্লিপের প্যাড আর পেনসিল এগিয়ে দিয়ে বেয়ারা বলল—এতে লিখে দিন। আমি দিয়ে আসছি।

স্লিপের ওপর খসখসিয়ে নাম লিখে দিল শৌভিক, তার নীচে তার আগমনের কারণও উল্লেখ করে দিল।

—বসুন আপনি। আমি আসছি। বেয়ারার শশব্যস্ত প্রস্থান। শৌভিক ওয়েটিংরুমে গিয়ে বসে। মনে মনে একটু হাসিও আসে তার। এ রকম অবাঞ্ছিত আগন্তুককে কে আপ্যায়িত করবে?

বেয়ারা ফিরে এল। নির্বিকার ভঙ্গীতে স্লিপটা শৌভিকের হাতে তুলে দিল।

—কি বললেন? স্লিপটা হাতে নিয়ে শৌভিক জিজ্ঞাসা করল।

টুলের ওপর বসে বেয়ারা জবাব দিল—উল্টোদিকে লেখা আছে।

স্লিপটা উলটিয়েই শৌভিকের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। কাগজটার উল্টোদিকে লাল কালিতে লেখা নো ভেকেন্সি প্লিজ্। মনে হল কথাগুলো তার গালের ওপর চড় মারার আঘাত করেছে। বর্তমানকালের মানুষদের ভিতর, এইটুকু সৌজন্য বোধও নেই, যে এক জন আগন্তুকের সঙ্গে দেখাও করে না।

আবার ফুটপাতে এসে নামে শৌভিক।

সামনেই টেলিফোন ভবন।

মীনাক্ষী সেনের কর্ম-ভবন। ওই প্রাসাদের কোন একটা ঘরে মীনাক্ষী কানে রিসিভার লাগিয়ে দূরের মানুষের কণ্ঠস্বরকে আর একজনের কানে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, নিপুণ আর তৎপর হাতে।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ছুটো বাজতে পনেরো।

মীনার ডিউটি শেষ হবার সময় হয়ে এসেছে। ছ'টোয় ডিউটি শেষ হবে। একটু অপেক্ষা করে এক সঙ্গেই বাড়ি ফেরা যাবে।

টেলিফোন-ভবনের একতলায় ঢুকে বাঁ দিকের ঘরটায় গিয়ে বসে শৌভিক। তার মত অনেকে অপেক্ষা করছে প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা করার প্রতীক্ষায়। কেউ বা স্বামী, কেউ বা ভাবী-স্বামী।

তিনমাসের স্বপ্ন কোথা দিয়ে কেটে গেছে শৌভিক ভাল করে বুঝতেও পারে না। এই তিনমাস যেন অবচেতনার ভিতর দিয়ে পার হয়ে গেছে। অনেক কথ' মনে নেই, অনেক কথা আবছায়া স্বপ্নের মত মনের কোণে লেগে রয়েছে। স্মৃতি যে মানুষকে এত আনন্দ দিতে পারে, এ ধারণা শৌভিকের ছিল না।

লিফট্ নেমে এল উপরতলা থেকে। বন্ধ দরজা খুলে গেল আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মীনাক্ষী, সঙ্গে আর এক ভদ্রমহিলা।

শৌভিক মীনাক্ষীকে দেখে এগিয়ে যায় হাসিমুখে। হাসিমুখের অভ্যর্থনাও পায় বিপরীত দিক থেকে। মীনাক্ষীও এগিয়ে আসছিল লঘু পায়ে, কি ভেবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—জান শান্তিদি, এঁর নাম শৌভিক মিত্র। আমার—। মীনাক্ষীর কথাকে শেষ করতে না দিয়ে কটাক্ষ করে শান্তিদির উত্তর—বন্ধু।

লাল হয়ে ওঠে মীনাক্ষীর চোখমুখ। টেলিফোন ভবনের রূপোলী আলোর সঙ্গে মীনাক্ষীর গোলাপী-মুখের আভা মিশে যায়। শৌভিক এক পলকে দেখে নিয়ে নমস্কার জানায় শান্তিদিকে। শান্তিদিও প্রতি নমস্কার করেন।

এমন সময় শান্তিদির স্বামী এসে পড়েন। শান্তিদি মীনাক্ষীকে বলেন—চলি ভাই আজ। একদিন আসিস আমাদের বাড়িতে। তারপর কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলেন—একা নয়, জোড়ে।

—যাও। মীনাক্ষীর কপট রাগ। এ রকম রাগতেও বেশ ভাল লাগে।

শান্তিদি হাসতে হাসতে স্বামীর সঙ্গে চলে যায়। যাবার সময় শৌভিককে নমস্কার জানিয়ে বলেন—চলি, আবার দেখা হবে।

মীনাক্ষী শান্তিদির চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, তারপরে শৌভিকের দিকে ঘুরে প্রশ্ন করল—সন্ধান পেলে কিছু?

—না। শৌভিকের হতাশা।—যেখানেই ঘুরি, বলে কাজ খালি নেই।

—ভেবো না। নিশ্চয়ই একটা কোথাও জুটে যাবে। মীনাক্ষীর সান্ত্বনা।

—ভাবি নি। ম্লান হাসি বেরিয়ে এল শৌভিকের মুখ থেকে। সে হাসি কান্নারই সামিল। তারপরে বলল, চলো এককাপ চা খেয়ে বাড়ি ফেরা যাবে।

—বাড়িতেই চলো। মীনাক্ষী বলল।

—তাহলে আমার বাড়িতে চলো। বউদি আলাপ করতে চেয়েছে তোমার সঙ্গে।

—বেশ, তাই চলো।

মীনাক্ষীকে দেখে বউদি হাসিভরা অভ্যর্থনা জানালে। প্রথম আলাপেই তুমি সম্বোধনে নেমে এল সুলতা। হাসতে হাসতে বলল—ঠাকুরপো, তোমার কথা এত বলেছে, যে তুমি একেবারে চেনা হয়ে গেছ।

লজ্জানত মুখে বসে থাকে মীনাক্ষী।

—বোস ভাই, আমি চা তৈরি করে আনছি। সুলতার আপ্যায়ণ।

—চলুন, আমিও রান্নাঘরে আপনার সঙ্গে গল্প করি।

—তাই চলো। তারপর শৌভিকের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি একা একা কড়িকাঠ গোন।

দুজনে রান্নাঘরে আসর জমিয়ে ফেলে অল্পক্ষণের ভিতর। সুলতা চায়ের জল উনুনে চাপিয়ে বলল—ঠাকুরপো একেবারে ছেলেমানুষ। এ কদিন চাকরি নেই, ভেবে একসা।

—সত্যি বউদি। দুর্ভাগ্য আমার। মীনাক্ষী ম্লানকণ্ঠে জবাব

দেয়—আমার সঙ্গে দেখা হল আর ওঁর চাকরিটা গেল।

বউদি চোখ পাকিয়ে বলে—ও, তাই অত ভাব। দুজনেই সমান পাগল।

মীনাক্ষী হেসে ফেলে বউদির কথায়। বউদিকে যতই দেখছে, ততই ভাল লেগে যাচ্ছে তার। কোথায় যেন একটা মিষ্টি আমেজ আছে বউদির চরিত্রে, মানুষকে কাছে টেনে নেবার একটা অদৃশ্য ক্ষমতা আছে।

—তুমি একটু বোস ভাই। সুলতার ব্যস্ততা—আমি দেখে আসি ঠাকুরপোর হাত পা ধোয়া হয়েছে কি না?

পাশের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে গেল সুলতা। মা-ছেলের কথা কানে এল। দরজার আড়াল থেকে শুনতে পেল মা শৌভিককে বলছেন—ছি, ছি তোর লজ্জা হওয়া উচিত। বউমার কানের দুল আজ খুলে নিয়ে গেছে কৌশিক। একটি টাকা নেই সংসার খরচের, আর উনি নেচে বেড়াচ্ছেন।

শৌভিক চুপ।

সুলতা তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছিল রান্নাঘরে, কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েই থ'। কখন যে তার পিছনে মীনাক্ষী এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতেও পারেনি। মীনাক্ষীর কানে যে মায়ের কথা পৌঁচেছে, এ বিষয়ে সুলতার সন্দেহ নেই। তা নইলে, ও এমন ভাবে তার কানের দিকে তাকিয়ে আছে কেন?

—চলো, চলো, চায়ের জল এতক্ষণে হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। কোন রকমে টানতে টানতে মীনাক্ষীকে রান্নাঘরে নিয়ে গেল সুলতা।

মনটা অকস্মাৎ খারাপ হয়ে গেল মীনাক্ষীর। শৌভিকের মায়ের গঞ্জনা সে নিজের কানে শুনেছে। চোখ বুজে সে শৌভিকের ফ্যাকাশে অসহায় মুখখানা দেখতে পাচ্ছে। শৌভিকের ব্যথা যেন তার মনেও সঞ্চারিত হয়েছে কোন এক গোপন পথ দিয়ে।

কোন রকমে গরম চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল মীনাক্ষী।

—ও কি! এরই মধ্যে চললে? সুলতা বাধা দিতে গেল।

—হ্যাঁ বউদি। আজ চলি, আবার একদিন আসবো। মীনাক্ষী একরকম ছুটে পালিয়ে গেল। শৌভিকের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে পারল না সে।

॥ সাত ॥

দিনগুলো যে এত তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে পারে, এ ধারণা মীনাক্ষীর কখনো ছিল না। এক মাস পার হয়ে গেল কোথা দিয়ে, সে বুঝতেও পারে নি শৌভিকের সান্নিধ্য। প্রত্যহ ডিউটি শেষের পর শৌভিকের সঙ্গে মিলেছে, কোনদিন রেস্টুরেন্টে, কোনদিন আউটরাম ঘাটের কিনারে দুজনে পাশাপাশি বসেছে। কত গল্প, কত কথা হয়েছে। শৌভিকের চাকরির নানা পরামর্শ করেছে দুজনে, উঠে যে যার বাড়ি চলে গেছে।

মাসকাবারে ক্যালেণ্ডারের পাতাটা ছিঁড়তে গিয়ে থেমে গেল মীনাক্ষী। পাতাটার দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে। মায়া লাগে ছিঁড়ে ফেলতে। এই দিনগুলিই যেন তার জীবনের সম্পদ। আলতো ভাবে গুটিয়ে আলপিন গেঁথে দেয় ক্যালেণ্ডারের পাতার সঙ্গে। পরের মাস বেরিয়ে আসে নতুন দিনের আশ্বাস নিয়ে। মনটা একটু ছ্যাঁৎ করে ওঠে। যে মাস আসছে, কেমন যাবে কে জানে ?

ডিউটির সময় হয়ে এসেছে। ভোর ছটা থেকে দুপুর দুটো অবধি। মীনাক্ষী গুনগুনিয়ে গান ধরে আপন মনে নিজের অজান্তে চুলের ওপর চিরুণী বোলাতে বোলাতে। মীনাক্ষীর পরিবর্তন আর কারো চোখে পড়ুক না পড়ুক, মায়ের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে নি। তিনি মেয়ের পরিবর্তন অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে গেছেন, দেখেছেন শাড়ির

পারিপাট্য দৈনন্দিন বেড়েছে, প্রসাধনের মাত্রা বেড়ে গেছে। মেয়ের মুখে গানের গুঞ্জনধ্বনি জেগেছে।

সেজেগুজে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল মীনাক্ষী। মা নির্বাক হয়ে শুয়ে রইলেন তাঁর বিছানায়। আজকাল তিনি আর ভোরবেলা উঠতে পারেন না, তাই মীনাক্ষী মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও এক জন বিধবা মহিলাকে রান্নার কাজে বহাল করেছে।

মীনাক্ষী বেরিয়ে যাবার পর মা বললেন—হ্যাঁ গা, মীনা খেয়ে গেছে কিছু ?

শুকনো স্বরে রাঁধুনী জবাব দিল—না মা, দিদিমণি বললেন—দেরি হয়ে গেছে। বাইরে খেয়ে নেবেন।

মা নিজের মনেই গজরাতে থাকেন, এবার মেয়েটাও মরবে।

ছুটো বাজার কিছু আগেই শৌভিক টেলিফোন ভবনের সামনে দাঁড়ায়। তার মনের বোঝাপোড়া কাল সারারাত করেছে। একটা সিদ্ধান্তে আজ আসতেই হবে। এ ভাবে আর কতদিন চলবে ? মীনার কাছ থেকে আজ মত জেনে বাড়িতে কথাটা তুলবে। কার কাছে তুলবে ? মা, দাদা, না বউদি ? কিন্তু—

জি. পি. ও-র ঘড়িতে ছুটো বাজলো আর লিপট্ থেকে বেরিয়ে এল মীনাক্ষী। শৌভিক অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে। এত সুন্দর মীনা !

—কি দেখছ ? মীনার লজ্জা-মাখানো জিজ্ঞাসা।

—তোমায়।

—আমি কি চিড়িয়াখানার জীব ? মীনার চোখে চটুল কটাক্ষ।

—না। মনে হল স্বর্গ থেকে নেমে এলে ঐ লিফ্‌টে করে। একেবারে দেবকন্যা।

—হে ধরাধামের ঋষিপুত্র! দেবকন্যাকে এবার তবে তোমার যেখানে খুশি নিয়ে চলো। সে তো মর্ত্যের কিছুই চেনে না।

—তথাস্তু। শৌভিক হেসে বলে—তাহলে চলো, জঠরের জ্বালা

আগে নিভিয়ে নিই। তারপর অন্য সব কথা।

—উঁহু। আমার খিদে নেই।

—দেবকন্যাদের খিদে না থাকাই সম্ভব, কিন্তু আমি মর্ত্যের মানুষ। না খেলে আমার চলে না।

—না। একটু অভিমান-ভরা গলায় মীনাক্ষী বলল—রোজ রোজ তুমি আমায় খাওয়াও। এদিকে চাকরি নেই, অত খরচ করতে আমার মায়া লাগে।

—দেব-দেবীদের বাণী শুনতে শুনতে মর্ত্যের লোকের প্রাণ যাবার উপক্রম। এখন দয়া করে চলুন।

দুজনে একটি এয়ার-কণ্ডিশান রেস্টুরেণ্টে ঢুকে পড়ে। শৌভিক দু প্লেট খাবারের অর্ডার দিয়ে মীনাক্ষীকে বলে—আজ তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

প্রশ্নালু চাহনি মীনাক্ষীর চোখে।

—বলছিলাম—। কথাটা শেষ করতে পারে না শৌভিক। থেমে যায়।

—কথাটা কি খুবই শক্ত? বলতে গিয়ে আটকে গেলে?

—আর কতদিন এমনিভাবে চলবে?

মীনাক্ষীর মাথা নীচু। আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর দাগ কাটতে কাটতে মৃদুকণ্ঠে বলে—চালানোর মালিক তো তুমিই।

বয় খাবার নামিয়ে দিয়ে যায়। মীনাক্ষী শৌভিকের ভাগটা তার সামনে নামিয়ে দিয়ে নীরবে আহার আরম্ভ করে।

—আজ আমি বাড়িতে কথাটা তুলব। শৌভিক খেতে খেতে আপনমনেই বলে।

—আমার মায়ের কি হবে? করুণকণ্ঠে মীনাক্ষী বলে—আমি চলে গেলে মাকে কে দেখবে?

—কেন? শৌভিক সমস্যাটাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে বলে—তুমি দেখবে। তোমার মা যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন তোমার মাইনে মাকেই দেবে।

মীনাক্ষী মুখ তুলে শৌভিকের দিকে তাকায়। এমন একজন লোকও যে পৃথিবীতে আছে, এ কথা বিশ্বাস করতে মন চায় না, অথচ বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। সে নিজের কানেই স্পষ্ট আশ্বাসবাণী শুনেছে।

খাওয়া শেষ করে শৌভিক দাম মিটিয়ে দিয়ে বলল—কাল আবার দেখা হবে। পাকাপাকি খবর কাল বলব। তারপর যাব তোমার মায়ের কাছে।

শৌভিক বাড়ি ঢুকতেই বউদি বলল—ঠাকুরপো একটা শুভ-সংবাদ।

—কি ব্যাপার! শৌভিক অবাক হয়ে যায়। কি এমন শুভ-সংবাদ যে সদর দরজার মুখেই খবরটা দিতে হবে।

—ভিতরে চল, তোমার দাদাই বলবেন।

একটু অবাক হয়ে শৌভিক ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে আরও অবাক। কৌশিক ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে, তার সঙ্গে আর এক ভদ্র-লোক এবং ঘরের মাঝে চেয়ারে উপবিষ্ট সাহেবী পোশাকে আর এক অপরিচিত বাঙালী ভদ্রলোকের সামনে টেবিলের ওপর ধূমায়িত চায়ের কাপ, কাঁচের প্লেটে একপ্লেট মিষ্টি আর একগ্লাস জল। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় তাঁর বয়স এসে ঠেকেছে।

—নমস্কার কর শৌভিক। মোলায়েম আদেশের সুরে কৌশিক বলে—ইনি আমাদের অফিসের মালিক মিঃ সোমেশ্বর বাসু। আর ইনি, পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোককে পরিচয় করিয়ে দেন—রবি পুর-কায়স্থ, আমার সহকর্মী।

উভয়কে নমস্কার করে শৌভিক বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। বাসু সাহেব কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে একটু হেসে বললেন—খাসা দেখতে আপনার ভাই মিঃ মিত্র। স্মার্টও। আমার পছন্দ হয়েছে। তাহলে ওই কথাই রইল। কাল আপনারা আসুন। বাসু সাহেব উঠে দাঁড়াল। কৌশিক আর রবিবাবু বাসু সাহেবকে ট্যাক্সি ডেকে তাতে

তুলে দিয়ে ফিরে এলেন।

রবিবাবু চায়ের কাপ হাতে নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে বললেন—একেই বলে কপাল কৌশিকবাবু। আপনার ভাই এক সঙ্গে রাজত্ব আর রাজকন্যা পেয়ে গেল।

শৌভিক চমকে ওঠে। রাজকন্যা! তার কি বিয়ের সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে?—কি ব্যাপার বল তো দাদা? শৌভিক প্রশ্ন করে বসে।

—ব্যাপার আর কি? আজ সকাল বেলায় বড় সাহেব অফিসে আমায় বললেন, মিঃ মিত্র, কোন ভাল পাত্র জানা আছে, আমার মেয়ের জন্যে? ভাল পালটি ঘর চাই।

আমি একটু ইতঃস্তত করে তোর কথা বললাম। বাসু সাহেব আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—তাহলে আর কোন কথাই নেই, আজই তোমার ভাইকে দেখতে যাব।

আমি জানালাম, আমার ভাই বেকার।

উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন—আমার জামাই কখনো বেকার থাকে? হি উইল বি দি সুপারভাইজার অফ দিস ফার্ম। আরও একটা কথা মিঃ মিত্র। এ বিয়ে হলে আপনাকে একটা সেকশনের ইনচার্জ করে দেব। তবে বিয়েটা খুব তাড়াতাড়ি দিতে চাই।

উনি আজ এসে তোমায় দেখে গেলেন, তুমি, আমি, আর রবিবাবু কাল বিকেলে ওর মেয়েকে দেখতে যাব।

শৌভিক স্থির, নিস্পন্দ।

—এতদিন তুমি বিয়েতে মত দাওনি, আমিও জোর করিনি, কিন্তু এ পাত্রী হাতছাড়া করা যায় না। এর ওপর তোমার আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

—আর পাত্রীও চমৎকার। রবিবাবু কথা বললেন এবার—রূপে-গুণে লক্ষ্মী-সরস্বতী। অত বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু কোন গুমোর নেই।

—কিন্তু—

শৌভিকের কথাটাকে আটকে দিয়ে কৌশিক অনেকটা আদেশের

স্বরে বললেন—এরপর আর কোন কিন্তু নেই। তুমি কাল কোথাও বেরোবে না। টিফিনে আমরা এসে তোমায় নিয়ে যাব। কথা বাড়তে না দিয়ে কৌশিক আর রবিবাবু বেরিয়ে গেলেন।

বউদি ঘরে ঢুকে বললেন—ওসব জানি না, মিষ্টি খাওয়াও। মা বললেন—এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। ভাইঝি আবদার জোড়ে—কাকু আমায় একটা গলার হার তৈরি করে দিতে হবে কিন্তু।

শৌভিকের মুখে কোন কথা নেই।

—কি ব্যাপার! বিয়ের কথা শুনেই যে মূর্ছা! বউদির টিপ্পনী।

—বউদি! শৌভিকের গলায় অসহায় করুণ সুর—এ বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারব না।

—ছেলেমানুষী করিস না। অনেক বয়স হয়েছে। মা গম্ভীর হয়ে বলেন—বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন ভাল জায়গাতেই বিয়ে হওয়া ভাল। আর অমত করিস না। মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, পাছে ছেলের থেকে আরও কথা শুনতে হয়।

বউদি সান্ত্বনার সুরে বলে—মেয়ে তো কাল দেখে এস। পছন্দ না হলে আমায় বলো, ব্যবস্থা করব তখন।

—বউদি! ছটফট করে ওঠে শৌভিক। ভেতর থেকে একটা জ্বালা বেরিয়ে আসছে।—তুমি বুঝছ না। আমার বিয়ে করার উপায় নেই।

একদৃষ্টে শৌভিকের দিকে তাকিয়ে থাকে সুলতা। অনেকক্ষণ পরে ধীর গম্ভীর স্বরে বলে—একথা আমায় বল নি কেন?

—আজই বলতে এসেছিলাম। আজই মীনাক্ষীকে পাকা কথা দিয়েছি।

—পাকা কথা যখন দিয়েছ, তখন আর আমাদের মত চাচ্ছ কেন? বউদির গলায় অভিমান উপছে পড়ে।

—বউদি, আমায় ক্ষমা কর।

—কিন্তু তোমার দাদার অবস্থাটা ভেবে দেখ। তিনি তাঁর

মালিককে কথা দিয়েছেন। এ সময়ে কথার খেলাপ হলে তাঁর চাকরিও যাবে। তখন—?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে শৌভিক বলে কাল মেয়ে দেখতে যাব। তারপরের ব্যবস্থা পরে।

বউদি কাছে এগিয়ে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলে —মীনাক্ষীর আর কে আছে ?

—বিধবা মা।

—আমাদের পালটি ঘর ?

—না। ওরা বৈদ্য, সেন।

—বউদির মুখ শুকিয়ে যায়। ম্লানকণ্ঠে বলে—তুমি অসবর্ণ বিয়ে করবে ?

—ওটা এ যুগে কোন সমস্যাই নয়।

—কিন্তু ঠাকুরপো, আমার মেয়ে আছে, তার বিয়ে দিতে হবে। তখন কি হবে ?

—বেশ, আমার সংস্পর্শে থাকলে যদি মেয়ের বিয়ে না হয়, তাহলে আমায় তাড়িয়ে দাও। আলাদা করে দাও।

—তাড়িয়ে দিলে বা আলাদা করে দিলে রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। আমি অশিক্ষিত। আমি অত-শত বুঝি না। তোমরা একালের ছেলে, যা ভাল বোঝ কর। আমার বলবার কিছু নেই। উদ্যত কান্নাকে কোনমতে চেপে সুলতা ঘর হতে বেরিয়ে যায়। শৌভিক একইভাবে সেখানে বসে থাকে। কি করবে ভেবে পায় না।

পরদিন নির্ধারিত সময়ে শৌভিক, কৌশিক আর রবিবাবু বাসু সাহেবের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির সামনে উপস্থিত হল। বাসু সাহেব বারান্দায় পায়চারি করছিলেন, ওদের দেখে গেট খুলে নেমে এসে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

—আপনাদের অপেক্ষায় ছিলাম। বাসু সাহেবের গলায় কন্যা-দায়গ্রস্ত পিতার উৎকণ্ঠা। বড়সাহেবের গাম্ভীর্য বিলীন।

—কিছু জলযোগ হোক আগে। অনুমতি পাবার আগেই বাসু সাহেবের গলা উচ্চমার্গে উঠে যায়—বেয়ারা!

তটস্থ বেয়ারার আবির্ভাব।

—বাবুলোককা ওয়াস্তে মিঠাই আউর শরবৎ। বেয়ারার প্রস্থান। আবার কন্যার পিতার কণ্ঠস্বর—মিষ্টির আয়োজন করেছি। শুভ-কাজে মিষ্টিই শুভ। তারপর অনেকটা আপন মনে আওড়ে যান—আমরা যতই সাহেব হই না কেন, মনে-প্রাণে আমরা বাঙালী। আজকালকার রেওয়াজ উঠেছে, অসবর্ণ বিয়ে, রেজেস্ট্রি বিয়ে। এগুলো যে কত খারাপ, কত হীন, সে কথা আজকের ছেলেমেয়েরা বোঝে না, এখন বুঝবে না। বুঝবে তখন, যখন তারা বাপ-মা হবে। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে গিয়ে যখন হিম-সিম খেয়ে যাবে।

বাসু সাহেব হয়তো আরও বকে যেতেন, যদি বেয়ারা না আসত। খাবার প্লেট সামনে সাজিয়ে দিয়ে বাসু সাহেব বললেন—আগে মিষ্টিমুখ হোক, তারপর মেয়ে দেখবেন।

খাওয়া পর্বটুকু নীরবে সমাধা হল।

—এবার তাহলে মাকে নিয়ে আসি? বাসু সাহেবের অনুমতি ভিক্ষা। একেবারে হাত জোড় করে।

—নিশ্চয়ই। কৌশিক দাঁড়িয়ে উঠে বলে—অত কিন্তু কিন্তু করবেন না স্যার। তাতে আমাদের অস্বস্তি আরও বাড়বে।

বাসু সাহেবের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। অফিসের বড় সাহেবের হাসি।—বেশ, শুনে খুশি হলাম।

বাসু সাহেব অন্দর-মহলে যান এবং কিছুক্ষণ পরেই মেয়েকে নিয়ে আবার বেরিয়ে আসেন।

শৌভিক মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত। ঠোঁট-দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। চোখ নামিয়ে নেয়। সামনে সীমা।

চক্রধরপুরে পুলিশে জ্বর অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল।

আবার চোখ তুলল।

সীমার মুখখানা শুকনো। চোখের পাতা ফুলো-ফুলো। চোখ লাল, মুখে একটা মৌন বিদ্রোহের ছাপ।

—কিছু জিজ্ঞাসা করবেন? বাবু সাহেবের জিজ্ঞাসায় শৌভিকের চমক ভাঙে।

—না। ওঁকে যেতে বলুন।

সীমাকে নিয়ে আবার বাসু সাহেব ঘরের ভিতর চলে যান। দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পায় শৌভিক। বুঝতে পারে, ধরে এনে বন্দী করে রেখেছেন, যে ভাবে হোক বিয়ে দিতে পারলেই মুক্তি।

—কেমন দেখলেন? বাসু সাহেব ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন।

—এমন লক্ষ্মীপ্রতিমাকে দেখার আর কি আছে? রবিবাবুর মন্তব্য।

—এমন ঠাণ্ডা মেয়ে আজকাল চোখে পড়ে না। বাসু সাহেব বলেন—নিজের মেয়ে বলে বলছি না। বাবার কথার এমন বাধ্য খুব কম দেখেছি। যা বলি তাই শোনে। অন্য ছেলেমেয়েদের ভালো বাড়িতে বিয়ে দিয়েছি। ইচ্ছে আছে, এই মেয়েটিকে সুপাত্রে দিয়ে, তাকে ব্যবসা বুঝিয়ে দিয়ে শেষ ক'টা দিন তীর্থে তীর্থে কাটাবো।

—আপনি বিয়ের দিন দেখুন। কৌশিক বলে—যেদিন বলবেন আমি রাজী।

—শুনে যে কি আনন্দ হল কি বলবো? বেঁচে থাকো বাবা, সুখী হও। বাসু সাহেবের আপনি-তুমির ভেদাভেদ গোলমাল হয়ে যায়। চোখে বোধ হয় জলও এসে যায়।

রাস্তায় নেমে শৌভিক দাদাকে বলে—তোমরা যাও, আমি একটু ঘুরে যাচ্ছি।

—তাড়াতাড়ি আসিস। অনেক কথা আছে

শৌভিক একরকম ছুটে পালায় ওখান থেকে। ডালহাউসী-

গামী একখানা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ে। আজ মীনাক্ষীর সঙ্গে বোঝা-পড়া শেষ করতে হবে। হাতে আর দিন নেই।

টেলিফোন ভবনের নীচে এসে শৌভিক দেখে মীনাক্ষী তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। কাছে যেতে মীনাক্ষী জিজ্ঞাসা করলো—এত দেরি আজ ?

—অনেক কথা আছে। চলো শিগ্‌গির।

—কোথায় ?

—যে কোন একটা নির্জন জায়গায়।

দুজনে আউটরাম ঘাটের একপাশে একটা নির্জন জায়গা দেখে বসে পড়ে। মীনাক্ষী একটু অবাক হয়েই বলে—কি ব্যাপার ? মুখ এত শুকনো কেন ?

শৌভিক একেবারে মীনাক্ষীর মুখোমুখি।—একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই মীনা।

—বলো।

—আমাদের বিয়েতে বোধহয় বাড়ির মত থাকবে না। কাল বউদির কাছে কথাটা পেড়েছিলাম। অসবর্ণ বিয়ে শুনে বউদি পেছিয়ে গেলেন। দাদা আর মা-ও সেই কথা বলবেন। আমি বলছিলাম, চলো আমরা রেজেস্ট্রি ম্যারেজ করে আসি। ওরা যদি আমাদের ত্যাগ করে, আমরা আলাদা বাসা করে থাকবো।

—না। অকম্পিত স্থির মীনাক্ষীর কণ্ঠস্বর, ও রকম বিয়েতে আমার মত নেই। যেদিন তোমার বাড়ি আমায় বউ বলে বরণ করে নেবে, সেইদিনই আমি মাথায় সিঁদুর দেবো তার আগে নয়।

—কিন্তু—

—এর ভিতর কোন কিন্তু নেই শৌভিক। রেজেস্ট্রি বিয়ে আর সমাজ থেকে পালিয়ে যাওয়া তো একই কথা। কেন আমরা তা করবো ? আমরা তো অন্যায় করিনি কিছু। আজকের সমাজের দৃষ্টির সঙ্গে আগের যুগের সমাজের একটা সংঘর্ষ চলছে। এর শেষ হবেই। ততদিন অপেক্ষা করতে হবেই।

—ওরা যদি মত না দেয়?

—তাহলে অপেক্ষা করতে হবে। এক জন্মে না দিক পরের জন্মে দেবে। ততদিন অপেক্ষা করে থাকবো, তবু লুকিয়ে বিয়ে আমি করতে পারবো না। যেদিন তোমার সংসারের বরণডালা আমার মাথায় ঠেকবে, সেইদিনই আমি বধূরূপে স্বীকৃত হবো, তার আগে নয়।

—কিন্তু বিয়েটা তো তোমাতে আমাতে।

—শুধু তুমি-আমি নিয়ে সংসার নয়। আমার বধূত্ব সেইদিনই সার্থক হবে, যেদিন তোমার মা, তোমার দাদাকে আমার হাতের রান্না খাওয়াবো।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর মীনাক্ষী বললো—অবুঝ হোয় না শৌভিক। ধৈর্য ধরো।

—ওদিকে যে দাদা এক কাণ্ড করে বসে আছেন?

—কি?

শৌভিক সবিস্তারে সীমার ব্যাপারটা বলে।

মীনাক্ষী সব শুনে হেসে বলে—এতে দুঃখ করার কি আছে? বিয়ে যদি না-ই হয় আমাদের, তবু তোমায় কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। তুমি আমার অন্তরে চিরকাল জ্বলজ্বল করবে। তবু আমি মাথা নীচু করে কোন কিছু করতে পারবো না।

—বেশ, তোমার কথাই শিরোধার্য।

॥ আট ॥

কৌশিক আজ একটু সকাল সকাল অফিসে এসেছে। বড়সাহেব জানিয়েছেন সকালে আসার জন্য। তার সঙ্গে কী গোপন কথা আছে বলেছেন।

কৌশিক অফিসে ঢুকে দেখে বড়সাহেবের ঘরের সামনে তাঁর

খাস বেয়ারা জনার্দন টুল শোভা করে বসে। তার উপস্থিতিই প্রমাণ করছে ভিতরে বাসু সাহেব বর্তমান। ছাতাটা নিজের চেয়ারের পাশে রেখে কোনমতে কৌশিক জনার্দনের সামনে এসে দাঁড়ায়। জনার্দন ওকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানায়। আজ যেন একটু বিশিষ্ট সমীহ। অন্য রকমের অভ্যর্থনা।—সাহেব এসেছেন? প্রায় ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করে কৌশিক। বিগলিত হেসে জনার্দনের প্রত্যুত্তর —আপনার জন্যেই বসে আছেন।

—যাবো?

—নিশ্চয়ই।

জড়িত পায়ে কৌশিক বড়সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকেই অবাক। সাহেবের ঘরের মাঝখানে একটা কাঠের পার্টিশান। আগের দিনও এ পার্টিশান দেখেনি কৌশিক।

—আরে কৌশিকবাবু, আসুন, আসুন। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন মিঃ বাসু—আপনার জন্যেই বসে আছি।

—বলুন স্যার। কৌশিক কাঁচু-মাঁচু।

—বসুন। সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন মিঃ বাসু।

—ঠিক আছে স্যার।

বাসু সাহেব হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিল ঘুরে কৌশিকের পাশে এসে বললেন—আসুন আমার সঙ্গে।

বিস্মিত কৌশিককে নিয়ে পার্টিশানের ওপারে গেলেন। নতুন রিভলভিং চেয়ার। তার সামনে নতুন সেক্রেটারিয়েট্ টেবিল। টেবিলের তিনদিকে স্প্রীং দেওয়া গদির চেয়ার। টেবিলের ওপর লেখার সাজ সরঞ্জাম।

বিহ্বল দৃষ্টি মেশানো চোখদুটো বাসু সাহেবের দিকে ঘোরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল কৌশিকের। বাসু সাহেব খানিকটা লজ্জা খানিকটা আনন্দ মিশিয়ে বললেন—সব কাল সন্ধ্যেবেলায় চৌরঙ্গী থেকে আনিয়েছি।

একটুখানি থেমে আবার বললেন—এইখানে শৌভিককে বসাবো

ভাবছি।

কৌশিক নীরব।

—ভেবেছি, ওর হাতে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি রিটায়ার্ড হবো। আই শ্যাল টেক্ কম্প্লিট্ রেস্ট। একটা আত্মতৃপ্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসে বাসু সাহেবের ভিতর থেকে।

—আপনি যা ভাল বুঝবেন, করবেন। কৌশিক কোনমতে জবাব দেয়।

—না, না। বাসু সাহেব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—আপনারও মতামতের প্রয়োজন বই কী। আপনি হলেন পাত্রের দাদা। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—ভেবেছি আপনাকে সেক্রেটারী করে দেবো। আমার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠছে। এখন আর আপনার কেরানীর কাজ শোভা পায় না।

কৌশিক পুলকিত। অনাগত দিনের সৌভাগ্যের কথা ভেবে আনন্দে চোখ বুজল সে।

—শৌভিক কি বলল পাত্রী দেখে? বাসু সাহেব আবার নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন।

—খুব পছন্দ হয়েছে স্যার।

—তাহলে আর কি? এবার তাহলে প্রথম শুভদিনেই কাজটা হয়ে যাক।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। নিজেকে যেন নিঃশেষ করে দিতে চায় কৌশিক। যত শীঘ্র, এ বিবাহ হয়ে যায়, ততই তার মঙ্গল, শৌভিকের মঙ্গল, সারা সংসারের মঙ্গল।

—ক'জন বরযাত্রী যাবে? বাসু সাহেবের চোখেমুখে আনন্দের ঝলক।

—ক'জন আর? শৌভিকের দু-একজন বন্ধুবান্ধব—।

বাধা দিয়ে বাসু সাহেব বললেন—না, না, দু একজন কি? ওর যত বন্ধু আছে, সবাই যাবে। আমার ছোট মেয়ের বিয়ে। এই তো জীবনের শেষ আনন্দ।

—বেশ স্যার, তাই হবে। কৌশিক যেন পালিয়ে যেতে চায়। এত সৌভাগ্য তাদের কপালে সহ্য হবে কি না কে জানে?

—এখন চলি স্যার, তাহলে?

—আচ্ছা। তাহলে সব কথা পাকাপাকি হয়ে গেল।

—আপনার কথার ওপর আর কোন কথাই নেই। কৌশিক নিজেকে সমর্পণ করে দেয় একেবারে।

—পাত্র পুরোপুরি মত দিয়েছে তো?

—শৌভিক মত দিয়েছে, তাছাড়া ওর মতের দাম কি আছে? আমি আর ওর বউদি যা করবো, তাতেই ওর পুরো মত।

—ভেরি গুড। একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন বড় সাহেব।—এই রকম পাত্রই আমি চাই, তা না—আজকালকার এক রোগ হয়েছে লাভ-ম্যারেজ। ওই জন্যেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল।

—সে কথা ঠিক। কৌশিকের মনে ঝিলক মারে শৌভিকের কথা। মীনাক্ষীকে শৌভিক ভুলবে তো?

—আচ্ছা, আমি চলি স্যার। কৌশিক কোনমতে ঘর থেকে পালিয়ে আসে।

শৌভিক কি মীনাক্ষীকে ভুলবে? মনের ভিতর কথাটা চক্রের আবা: ঘুরতে থাকে বারে বারে।

ভুলতেই হবে। না ভুললে চলবে না। শৌভিকের জীবনে এক দিকে ঐশ্বর্য, সম্পদ অন্যদিকে মীনাক্ষী। মীনাক্ষী তার জীবনে নিয়ে আসবে শুধু দারিদ্র, হাহাকার আর সন্তান। অন্যদিকে সীমা সাম্রাজ্যের ডালি সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। সংসারের রূপ বদলে যাবে। সবাই পেট ভরে খেতে পাবে, প্রাণ খুলে হাসতে পারবে।

ভুলতেই হবে। সংসারের বিনিময়ে, এ ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে শৌভিককে। সে কি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে, এই ত্যাগ স্বীকার করবে না?

চিন্তিত কৌশিক নিজের চেয়ারে বসে আগের দিনের ফাইলটা টেনে নেয় বুকের কাছে।

বাড়িতে ফিরেই থমকে গেল কৌশিক। একটা থমথমে ভাব বাড়ির আনাচে-কানাচে। চারদিকে একবার নজর চালালো সুলতার জন্যে, কিন্তু কোথাও তার উপস্থিতি চোখে পড়ল না। অন্যদিন দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে আঁচল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে। আজ তার এই অনুপস্থিতি একটু অবাক করে বই কি!

ঘরের ভিতর এসে আর এক দফা অবাক হল কৌশিক। খাটের এক কোণে মা আর সুলতা গম্ভীর হয়ে বসে, আর জানালার গরাদ ধরে শৌভিক আকাশের দিকে তাকিয়ে।

—যাক। বিয়ের সব পাকাপাকি করে এলাম। ছাতাটা ঘরের কোণে রেখে কৌশিক বাতাসে খবরটা ছুঁড়ে দিল যেন।

কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই অন্য পক্ষের। তিনজনই নির্বিকার।

—কি ব্যাপার? তোমরা এত চুপচাপ? কৌশিক আর থাকতে পারে না।

—তোমার ভাইকেই জিজ্ঞেস করো। মা ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে বললেন।

—কি হয়েছে রে শৌভিক? কৌশিক মায়ের পরিত্যক্ত জায়গাটা অধিকার করে।

—বউদির কাছেই শুনো। শৌভিক চলে যাচ্ছিল ঘর থেকে কিন্তু দাদার কণ্ঠস্বরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—দাঁড়াও। কৌশিকের গলার স্বর গম্ভীর—যা বলার আমায় বলো।

—আমার বিয়ে করা অসম্ভব। শৌভিকের চরম উত্তর।

—বিয়ে অসম্ভব, না বাসু সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করা অসম্ভব? কৌশিকের যাচাই।

—ওই বাসু সাহেবের মেয়েকে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না।

—কেন? কৌশিকের প্রশ্ন তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট।

—সে কথা আমি বলতে পারবো না।

—মীনাক্ষীর জন্যে? কৌশিকের তির্যক জিজ্ঞাসা।

—যদি বলি তাই?

—তাহলে বলবো, তুমি মীনাক্ষীকে ভুলে যাও।

—একজনকে ভোলা কি এত সহজ?

—ভুলতেই হবে শৌভিক। কৌশিকের কণ্ঠস্বর দৃঢ়—তুই যদি মীনাক্ষীকে বিয়ে করিস, তাহলে আমাদের পুরো সংসার উপোস করে মারা যাবে।

—কেন?

—তুই বাসু সাহেবের মেয়েকে বিয়ে না করলে আমার চাকরি যাবে, আর আমার চাকরি গেলে কি হবে বুঝতে পারছিস।

—কেন? আমি চাকরি করবো।

—কয়েকমাসেই বুঝেছিস নিশ্চয়, চাকরি যাওয়া যত সহজ, চাকরি পাওয়া তত শক্ত। কৌশিক শৌভিকের পাশে এসে দাঁড়ায়। নরম স্বরে ভাইকে বোঝায়—পাগলামি ছাড়। বড় সাহেবকে আমি কথা দিয়ে এসেছি তোর হয়ে।

শৌভিক ঘুরে দাঁড়ায়।

কৌশিক আপন মনেই বলে চলে—তুই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবি, আমি সেক্রেটারী হবো। আমাদের দুঃখের দিন ঘুচে যাবে।

সুলতা উঠে এসে শৌভিকের কাছে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে—আমাদের কথা নাই ভাবলে তুমি, কিন্তু কচি মেয়েটার কথা ভাবো। সুদিন এলে, তার বিয়েটা ভালভাবে দিতে পারবো, মেয়েটা অন্ততঃ সুখী হবে।

—বউদি, তোমরা আমায় ক্ষমা কর। শৌভিক উঠে দাঁড়ায়।

—শোন। সকলকে অবাক করে মা ঘরে ঢোকেন। গম্ভীর স্বরে জবাব দেন—তোমাকে আমরা খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছি। এখন সংসারের জন্য যদি তুমি না ভাব, তাহলে কিসের সন্তান? তুমি

তাহলে এ বাড়ি থেকে চলে যাও।

সুলতা মা-ছেলের মাঝখানে এসে কেঁদে পড়ল—মা, ও কথা বলবেন না। ঠাকুরপো আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে ?

তারপর শৌভিকের দিকে তাকিয়ে মিনতি ভরা কণ্ঠে বলল—ঠাকুরপো, আমায় ছুটোদিন সময় দাও। তোমার দাদা অফিসে কথা দিয়ে ফেলেছেন, দু'দিন একটু ভাবতে দাও, তারপর তোমার যা ইচ্ছে কোর।

শৌভিক কিছুক্ষণ নিজের মনে ভাবে, তারপর বলে—বেশ, তাই হবে।

শৌভিক নিজের ঘরে গিয়ে বসে। আপন মনে নিজের মনের মধ্যে চক্রের ভিতর ঘুরতে থাকে। কি করবে সে ? একদিকে মীনা অন্যদিকে সীমা। একদিকে দারিদ্র অন্যদিকে সম্পদের শিখর। মীনাক্ষী তার জীবনের ধ্রুবতারা আর সীমা তার সম্পদের সম্ভার নিয়ে আলেয়ার মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার সম্পদের জৌলুসে চোখ ঝলসে যাচ্ছে, আর কিছু দেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, সকলের দৃষ্টিশক্তি ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ, সীমিত। সীমা এলে শৌভিক জীবনের সব কিছুই পাবে, পাবে না শুধু একটি জিনিস। জীবনের প্রাণকেন্দ্র। জীবনের গতি যে বিন্দু থেকে সৃষ্টি, সেই বিন্দু হারিয়ে যাবে। পুরো জীবনটা একটা সাহারা হয়ে উঠবে।

না। সীমাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। মীনাক্ষীকে অস্বীকার করার ক্ষমতা তার নেই। সীমা তার নয়, কাল সকালেই সে বউদিকে সব কথা বলবে। তারপরেও যদি বউদি মত না দেয়, তাহলে এ সংসার ছেড়ে সে চলে যাবে। সব কিছুর বিনিময়, সে মীনাকে গ্রহণ করবে। সমাজ-সংসার যদি তাদের বিয়ে স্বীকার না করে, তারা অন্য সমাজে চলে যাবে, তবু নিজের মনকে অস্বীকার করার ক্ষমতা তার নেই। মনের সমাজ, মানুষের তৈরি সমাজের চেয়ে অনেক বড়।

॥ নয় ॥

ভোরবেলায় সুলতা একাই বেরিয়ে পড়ল। বাড়িতে বলে গেল সে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে। গঙ্গায় স্নান করে কালীঘাটে মা-কালীর পূজো দিয়ে ফিরবে। এসেই কৌশিকের অফিসের রান্না চড়িয়ে দেবে সে।

সুলতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা এসে উঠল মীনাক্ষীর বাড়িতে। মীনাক্ষী ডিউটি যাবার জন্য প্রসাধন শুরু করেছিল, বাইরে কড়া নড়ে উঠতে একটু বিস্মিত হয়েই দরজা খুলতে এল। এত ভোরে কে ডাকতে এল?

দরজা খুলেই মীনা অবাক!

—বউদি! আপনি?

—হ্যাঁ ভাই। সুলতা ঘরে ঢুকল। শুকনো মুখ। ক্লান্ত চোখের নীচে রাত্রি জাগরণের স্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত।

মীনাক্ষীর মুখ শুকিয়ে গেল। আতঙ্কিত স্বরে বলল—কি হয়েছে বউদি?

—ভীষণ বিপদ। সুলতা মীনার ঘরের মোড়ার উপর বসে পড়ল। মীনার হাত থেমে গেল। প্রসাধন অসমাপ্ত রয়ে গেল। দুরু দুরু বুকে বউদির পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বলল—কার বিপদ?

—সকলের। সুলতার কণ্ঠস্বরে যেন কান্না ঝরে পড়ছে।

—আমার বিপদ, সংসারের বিপদ, শৌভিকের বিপদ। প্রত্যেকেই এই বিপদে জড়িয়ে পড়েছে।

—কি হয়েছে বলুন? মীনাক্ষীর গলা শুকিয়ে এল প্রায়।

—তুমি ঠাকুরপোকে ভুলে যাও। মরিয়া হয়ে সুলতা বলে ফেলল শেষকালে।

মীনা বজ্রাহত। চোখের সামনে নানারঙের রামধনু। মাথাটা

টলে উঠল। পা কাঁপছে। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়ল সে।

দেয়ালের ঘড়িটা ঢং ঢং করে ছটা বেজে উঠল। মীনার মনে হচ্ছে ওতো ঘড়ির শব্দ নয়, ও যেন তার হৃদয়েরই ক্রন্দন-স্পন্দন।

সুলতা এসেছে মীনার সঙ্গে শেষ যুদ্ধ করার জন্য। এ আঘাত তাকে দিতেই হবে। শৌভিককে সরিয়ে আনতেই হবে মীনার কাছ থেকে। সে নারী, সে জানে নারীর বুকে এ আঘাত চরম বাজবে, তবু তাকে এ আঘাত দিতে হবে। সে শুধু নারী নয়, সে মা। তার শিশু-কন্যা তার চোখের সামনে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবে, আর তাকে তাই দেখতে হবে, এ কখনই সে পারবে না। দিক অভিশাপ। মীনাক্ষী অভিশাপ দেবে। দিক। সন্তানের জন্য সে অভিশাপ গ্রহণ করতে একটুও বাধবে না তার। সে মা।

—কই কিছু বললে না? সুলতা প্রায় ফিসফিসিয়ে উঠল।

মীনা পাথর।

সুলতা মীনার পাশে এসে দাঁড়ায়। মৃদুকণ্ঠে বলে—জানি আমি, এ আঘাত তোমার ভীষণ ভাবে লেগেছে, তবু আমি নিরুপায়।

মীনা একবার চোখ তুলে সুলতার দিকে তাকায়। সুলতা নিজের কথা উজাড় করে দিতে ব্যস্ত। তার মীনার দিকে নজর দেবার সময় নেই।

—তোমায় যদি শৌভিক বিয়ে করে, তাহলে আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাবো।

—একথা তো আগে থেকেই জানতেন। মীনার কঠিন কণ্ঠস্বর।

—জানতাম। বউদির কৈফিয়ৎ—তখন সীমা তোমাদের মাঝ-খানে এসে দাঁড়ায় নি।

—কিন্তু, আমি কি বলব বউদি? মীনার কণ্ঠস্বরে কান্নার সুর।

—তুমিই একমাত্র শৌভিককে দূরে সরিয়ে দিতে পার।

—কেন? সীমা পারল না তার ধন সম্পদ নিয়ে?

—না। পারে নি। সুলতার জবাব—পারবেও না। সত্যভামা-রুক্মিনীর কলহে কোনদিন সত্যভামা জেতেনি। চিরকাল রুক্মিনীর জিত হয়েছে।

—তবে আজ তার হার হবে কেন?

—হার নয়। সুলতা মীনার হাত দুটি আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে—তুমি জিতে রয়েছ। আমি এসেছি তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে নিতে।

—এ জিনিস কি ভিক্ষে দেওয়া যায় বউদি?

—দিতেই হবে। আমি এসেছি আমার স্বামী, আমার মেয়ের হয়ে। তুমি যদি তাদের মুখ চেয়ে আমায় এ ভিক্ষে না দাও, তাহলে সবাই না খেতে পেয়ে মারা যাব। মীনা, আমার সংসারের বিনিময়ে তুমি ঠাকুরপোকে ফিরিয়ে দাও।

—আমি কি নিয়ে থাকব? মীনার দুচোখে জল টলটল করছে। ঝোড়ো হাওয়ায় পদ্মপাতার উপর জলবিন্দু যেন টলমল করছে।

—জীবনে সবকিছু পাওয়া যায় না মীনা। সুলতার জবাব—শৌভিকের কথাও ভাব। সেই বা সারা জীবন কি ভাবে কাটাবে? সে সীমাকে বিয়ে করবে, সংসার করবে, তবুও কিছুই পাবে না। সে সব জেনেও সীমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে।

—কথা দিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—বেশ, সে যদি তোমাদের জন্যে ত্যাগ করতে পারে, আমিও পারব। তারই আদর্শে আমি জীবন পেয়েছি, তারই আদর্শে আমি তা ক্ষয় করব। কথা দিলাম বউদি। আমি পথের কাঁটা হব না।

সুলতা উঠে দাঁড়াল। তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। যাবার সময় নীচু গলায় বলল—তোমায় যে কি বলব?

—কিছু বলতে হবে না। তুমি যাও। হাউ হাউ করে মীনা কেঁদে উঠল। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে কেঁদে কেঁদে নিজেকে নিঃশেষ

করে আনতে লাগল। সুলতা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

বাড়িতে ঢুকেই সুলতা দেখল শৌভিক কোথাও বের হচ্ছে।

—এ কি ঠাকুরপো? সকালবেলায় কোথায় চললে?

—মীনার কাছে। শৌভিকের উত্তর স্পষ্ট ও স্বচ্ছ।

—সে ডিউটিতে। বউদি জানাল—আমি তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। দেখা পাইনি।

—তার কাছে কেন?

—জানাতে গিয়েছিলাম, তোমার সঙ্গে সীমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

—আমি কাল সারারাত ভেবেছি। সীমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব ঠাকুরপো?

—সীমা অন্যের বাগদত্তা। এ ক্ষেত্রে আমি বিয়ে করি কি করে?

মা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। একটু গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন —এই কি তোমার শেষ কথা?

—হ্যাঁ মা।

—আমাদের দিকটা একবার ভেবেও দেখবে না?

—দেখেছি। কাল সারারাত ভেবে দেখেছি। আমার বরপণের টাকায় যদি তোমাদের বাঁচতে হয়, তাহলে তোমাদের মরাই ভাল। আমার ওপর যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে ধৈর্য ধরো। আমি তোমাদের নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে রাখব।

—না, সে ধৈর্য আমাদের নেই। মা গর্জে উঠলেন।—যা ঠিক হয়েছে, তার অমত করলে, তুমি ইচ্ছে করলে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পার।

—তোমারও কি ওই একমত বউদি? শৌভিক সুলতার দিকে ফিরে তাকাল।

সুলতা কান্নায় মুখ ঢেকে কোন উত্তর না দিয়ে রান্নাঘরে ছুটে পালাল। মা একবার পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে ছেলের দিকে ফিরে গম্ভীর স্বরে বললেন—হ্যাঁ, বউমারও ওই মত।

—বেশ, তাহলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

—তাহলে তুমি মীনাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না ?

—না। শৌভিক বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মা নিশ্চল পাথরের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ভবিষ্যতের দারিদ্র কেমন কাল আঁধারে ছেয়ে আসছে, সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে একবার শিউরে উঠলেন।

—শৌভিক চলে গেল ? কৌশিক মায়ের পাশে এসে দাঁড়াল।

মা নিরুত্তর।

—আমি সাহেবকে কি বলব তাহলে ? কৌশিকের কণ্ঠস্বর ভয়ে কেঁপে উঠল। মা একবার তার আগুনের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—তোমার যা খুসি।

তারপরেই তিনি পূজোর ঘরে ঢুকে গেলেন।

॥ দশ ॥

কৌশিক অফিসে ঢুকল চোরের মত। যদি বড় সাহেবের নজরে পড়ে যায় সে, তাহলে চাকরির দফা গয়া। শৌভিক বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, বলার সঙ্গে সঙ্গে তার ডিসচার্জ লেটার তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু কিই বা বলবে সে বড় সাহেবকে ? কতদিন সে ঠেকিয়ে রাখবে মিথ্যে কথা বলে ? একদিন না একদিন সত্যি কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন কি হবে ?

ডিপার্টমেণ্টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রবিবাবু সাদর অভ্যর্থনা জানালেন কৌশিককে—আরে, এসো হবু সেক্রেটারী। অমন চুপ-চাপ কেন?

—সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদা। কৌশিকের গলা প্রায় শুকিয়ে গেছে।

—কেন? কি হল?

—ভাই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এ মেয়েকে সে বিয়ে করবে না সরাসরি জানিয়েছে।

—সর্বনাশ। শিউরে উঠলেন রবিবাবু, বড় সাহেবের কানে গেলে চাকরি রাখা মুস্কিল হয়ে পড়বে।

—কিন্তু বলতে তো হবেই। কৌশিক অসহায়।

—কয়েকদিন সময় চেয়ে নাও। রবিবাবু পরামর্শ দিলেন, বল ভাই বেড়াতে গেছে। ফিরে এলেই বিয়েটা হয়ে যাবে।

—সাহেব কি তাতে বুঝতে পারবেন না?

—বোধ হয় না। তাছাড়া অন্য পথও তো খোলা নেই।

রবিবাবুর কথাটা কৌশিকের ভাল লাগে। সাহেবকে বুঝিয়ে সুজিয়ে কিছুদিন আটকে রাখতে পারলে হয়ত, তার মধ্যে শৌভিক ফিরে আসতে পারে। হয়ত শৌভিকের মন ঘুরে যেতে পারে। দুরু দুরু বুকে সে অফিসের ফাইল খুলে ধরল নিজের সামনে।

দশটা থেকে ঘড়ির কাঁটা বারোটায় এসে ঠেকল, কিন্তু বড় সাহেবের দেখা নেই। অফিসের সবাই চিন্তিত। এ রকম তো ঘটে না। সাহেব চিরকাল দশটার আগেই অফিসে এসে ঢোকেন। আজ কি হল কে জানে?

ডিপার্টমেণ্টের একজন বলল—সাহেব এখন মেয়ের বিয়ের বাজার করতেই ব্যস্ত। অফিসের কথা মনেও নেই তাঁর।

ছ্যাঁৎ করে উঠল কৌশিকের বুক। সাহেবের সব আয়োজন যখন ব্যর্থ হয়ে যাবে, তখন কি হবে ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। কলমটা কেঁপে উঠল তার। হাতের লেখা বেঁকে গেল। নিরুপায় কৌশিক

কলম বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল।

আড়চোখে রবিবাবু একবার দেখে আবার নিজের কাজে মন দিলেন। কেরানীদের পরের দিকে নজর দেবার সময় কোথায়? নিজের কাঁধের জোয়াল খুলতে খুলতে জীবনের সায়াহ্ন উপস্থিত হয়ে পড়ে।

সাড়ে বারোটার সময় বড় সাহেবের গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। সবাই তটস্থ হয়ে যে যার টেবিলে কাজ নিয়ে বসে গেল। সারা অফিস একটা সামান্য যান্ত্রিক শব্দে নিঃশব্দ।

গট গট করে সাহেব ঘরে ঢুকলেন, গম্ভীরভাবে চারদিকে তাকিয়ে কৌশিককে বললেন—আপনি একবার আমার ঘরে আসুন।

ধড়াস্ করে উঠল কৌশিকের বুক। সাহেবের মুখ দেখে মনে হয় কোন অজানা বিপদ আসছে। ·কি হল তাহলে? সাহেব কি শৌভিকের পালিয়ে যাবার খবর পেয়েছেন। শৌভিক কি নিজেই গিয়ে সব বলে দিয়েছে সাহেবকে? কৌশিকের পা সেঁটে গেছে যেন মাটির সঙ্গে। নিজেকে কিছুতেই টেনে নিয়ে যেতে পারছে না, বড় সাহেবের ঘরের দিকে।

—যাও। সাহেব ডাকলেন তোমায়। রবিবাবুর তাড়া।

কৌশিকের বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে একেবারে। শুকনো জিবটা কোনমতে তালুতে ঠেকিয়ে দু একবার বিকৃত শব্দ করে উঠল, তারপর মনে মনে কালীকে স্মরণ করে বড় সাহেবের সুইং ডোর ঠেলে ঢুকে পড়ল।

—বিয়ের আয়োজন বন্ধ করে দিন। বড় সাহেব যেন বোমা ছুঁড়লেন একটা।

—কেন স্যার? কৌশিকের অস্ফুট জিজ্ঞাসা।

—অত কৈফিয়ৎ দিতে পারব না। বড় সাহেব গর্জে উঠলেন। তারপর তাঁর ভারী হাতের চাপে কলিং বেলটা থরথরিয়ে বেজে উঠল।

তটস্থ বেয়ারার প্রবেশ।

—ই সব টেবিল-চেয়ার বাহারমে ফেক দেও। সাহেব শৌভিকের জন্য সজ্জিত আসবাবের দিকে আঙুল দেখিয়ে আদেশ দিলেন। বেয়ারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটল কুলি ডেকে আনার জন্যে।

বেয়ারা বেরিয়ে যাবার পরই বড় সাহেব কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—আপনি আর দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান।

অবুঝ কৌশিক বোবা হয়ে বেরিয়ে এল। তার মস্তিষ্কের ভিতব কিছুই ঢুকছে না। সব যেন কেমন ধোঁয়ার মত মনে হচ্ছে।

ডিপার্টমেণ্টে আসতে রবিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, সাহেব কি বললেন?

—তাড়িয়ে দিলেন। চেয়ারটায় থপ করে বসে পড়ে কৌশিক বলল।

—তাড়িয়ে দিলেন? কেন?

—বোধহয় শৌভিক সাহেবের বাড়ি গিয়ে জানিয়ে এসেছে, যে সে বিয়ে করতে পারবে না।

—তাহলে? রবিবাবুও আতঙ্কে সোজা হয়ে উঠলেন।

—তাহলে আর কি? এখানকার অন্ন উঠল। নির্বিকারভাবে কৌশিকের জবাব। সে যেন আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। আর কোন আঘাতই তাকে কাহিল করতে পারবে না। সে অকস্মাৎ যেন মৃত্যুঞ্জয় হয়ে উঠেছে।

বড় সাহেবের খাস বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

—সাহেব ডাকছেন। কৌশিকের দিকে তাকিয়ে জানাল।

—চল, যাচ্ছি। কৌশিক উঠে দাঁড়াল। রবিবাবু কোন কথা বলতে পারলেন না। নিঃশব্দে মাথা নীচু করে নিজের ফাইলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি যেন নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চান। আজকের কৌশিকের এই অবস্থার জন্য তিনিও দায়ী খানিকটা। তিনিই বলেছিলেন বড় সাহেবকে কৌশিকের বিবাহযোগ্য ভায়ের কথা। তিনিই সম্বন্ধের মধ্যস্থতা করেছিলেন।

কৌশিক নীরবে সাহেবের কামরায় এসে ঢুকল। কুলিরা

শৌভিকের জন্য সাজানো চেয়ার টেবিল নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। সাহেব এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন—বসুন। কৌশিক দাঁড়িয়েই রইল। সাহেব বলে যেতে লাগলেন, বিয়ের আর দরকার হবে না কৌশিকবাবু। সীমা আত্মহত্যা করেছে।

কৌশিক নিজের অজান্তেই একবার কেঁপে উঠল। সাহেব বলে যেতে লাগলেন নিজের মনেই—কাল বাড়ি ফিরে দেখি একখানা চিঠি লেখা। বাবা, আমি গঙ্গায় ডুবে মরতে চললাম। আমায় ক্ষমা করবেন। সীমা।

একটুখানি থামলেন বড় সাহেব, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের ওপর একটা খাম পড়েছিল, সেটা তুলে কৌশিকের হাতে দিয়ে বললেন—এটা পড়ে দেখবেন। আমি চললাম।

বড় সাহেব স্যুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে গেলেন।

কৌশিকের হাতের ওপর খামের চিঠিটা যেন জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসল। খোলার সাহস হল না কিছুতেই। চিঠি না খুলেও সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে, এতে লেখা আছে, ইয়োর সার্ভিস ইজ নো লংগার রিকোয়ার্ড।

অসমর্থ পা দুটোকে কোনমতে ডিপার্টমেণ্টে টেনে নিয়ে এল কৌশিক। টেবিলের পাশ থেকে ছাতিটা তুলে নিয়ে রবিবাবুকে বলল—চললাম রবিবাবু।

—কোথায়?

—আর কোথায়? সাহেব চিঠি দিয়ে দিয়েছেন।

—কি লিখেছেন?

—দেখিনি। বাড়ি গিয়ে দেখব।

—কই দেখি? চিঠিটা রবিবাবু টেনে নিলেন।

চিঠিটা পড়তে পড়তে রবিবাবু লাফিয়ে উঠলেন। কৌশিককে এক রকম টেনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, পড়ো। পড়ে দেখ।

বিস্মিত কৌশিক চিঠিটা পড়তে পড়তে কেঁপে উঠল। তার দু-চোখে জল ঝরে পড়ল দরদর করে। বড় সাহেব জানিয়েছেন, তাঁর

কথামত কৌশিককে সেক্রেটারী পদে বহাল করা হল। সে যেন পরের দিন থেকেই কাজ বুঝে নেয়।

কৌশিক বাড়ি ফিরল সন্ধ্যা পার করে। অফিসে এক মুহূর্তও কাজ করতে পারে নি সে। অন্তরের কান্না আর হাসি একই সঙ্গে বুকের দরজায় ধাক্কা মেরে, মনটাকে উতলা করে দিয়েছে। যতবার কলম ধরেছে, ততবারই চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে গেছে। সে নিজেও পিতা, সন্তান হারানোর ব্যথা সেও অনুভব করে। এক একটি সন্তান যেন এক একটি পাঁজরা। সংসার থেকে কোন ছেলেমেয়ে চলে গেলে, পিতার মনে হয়, একখানা পাঁজরা খসে পড়ল। সেই মর্মাহত পিতা তাকে পুরস্কৃত করে গেলেন, তাঁর আশীর্বাদ নিঃশব্দে দান করে গেলেন আর এক দুস্থ পিতাকে।

কৌশিক যতবার বড় সাহেবের মহত্বের কথা ভেবেছে, ততবারই কলম থেমে গেছে। এক রকমের অঙ্ক কষতে গিয়ে আর এক রকমের ভুল অঙ্ক কষে বসেছে। শুধু মনের ভিতর একটা প্রশ্নই বার বার আঘাত করেছে, সীমা কী অন্যায় করেনি? ভালবাসা পাপ নয়, অন্যায় নয়, কিন্তু যে ভালবাসায় অভিভাবকের মন ভেঙে যায়, সংসারের ওপব দুর্দিন নেমে আসে, সে ভালবাসা কী কল্যাণময়ী? কৌশিক অত কথা জানে না। সে শৌভিকের মত উচ্চশিক্ষা লাভ করেনি। সাধারণ ভাবে ম্যাট্রিক পাস করে বাবার সংসারে সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাসু সাহেবের কোম্পানিতে। তারও তো বিয়ে হয়েছে। বাপ মায়ের পছন্দ করা একটি অপরিচিতাকে গ্রহণ করেছিল সে। যখন সুলতার সঙ্গে সপ্তপদী হয়েছিল, তখন সে তাকে দেখেও নি। কিন্তু সেই অপরিচিতা কন্যা আজ সংসারে পরম কল্যাণ ময়ী হয়ে উঠেছে। কোন্‌টে ঠিক?

বাড়িতে ঢুকে কৌশিক দরজার মুখে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। শৌভিক নেই, এ কথা ভাবতে কেমন খারাপ লাগছে। যে দিন শৌভিকের চাকরি হয়েছিল, যেদিন ও প্রথম মাইনে পেয়েছিল,

ছুটে এসে তাকে প্রণাম করে বলেছিল, এই নাও দাদা টাকা। সংসারের ভাবনা আর ভাবতে হবে না।

আজ কৌশিকের পদোন্নতির সময় সে কোথায়? আজ কাকে কৌশিক তার উন্নতির কথা বলবে?

ঘরের মধ্যে খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সুলতা। ঘুমিয়ে আছে কি না বোঝার উপায় নেই। তার পাশে খুকু পড়ার বই সামনে খুলে ঝিমোচ্ছে। হাঁটুর কাছে মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে। পড়ার সুর স্তিমিত হয়ে গেছে, এখন বিড়বিড়িয়ে বকছে।

—শুনছো? ছাতাটা ঘরের কোণে ঠেশান দিয়ে কৌশিক ডাকল।

সুলতার সাড়া নেই।

—ঘুমোচ্ছো?

—না, মরেছি। সুলতা মুখ ঘুরিয়ে বলল।

কৌশিক তাকিয়ে দেখে সুলতার চোখ ছুটো লাল টকটকে। কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে। সোজা হয়ে বসে সে জিজ্ঞাসা করল, বলো।

—বড় সাহেব আমাকে—।

—কৌশিকের কথাকে নির্লিপ্তভাবে অসম্পূর্ণ রেখে সুলতা বললো —জানি। বরখাস্ত করেছেন।

—না গো। আমায় সেক্রেটারী করে দিয়েছেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল কৌশিক। সুলতার পাশে বসে পড়ে বললো—এই দেখো, নিজে আমায় চিঠি দিয়েছেন।

—খুকু। ও ঘরে যাও। মেয়েকে নিরাসক্ত কণ্ঠে আদেশ দিল সুলতা। খুকু বই খাতা বগলে নিয়ে পাশের ঘরে উঠে যেতেই সুলতা স্বামীর ওপর রুখে উঠল প্রায়।—তুমি দয়া নিলে কেন? ঠাকুরপোর কথা সোজাসুজি জানালেই পারতে।

—তার আর সুযোগ পেলাম কোথায়? তার আগেই আরও ভীষণ খবর দিলেন বড় সাহেব।

সুলতার চোখের তারায় জিজ্ঞাসার চিহ্ন জেগে উঠল। ক্ষোভ, দুঃখ, কান্না, মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠল পরম ঔৎসুক্য।

—বড় সাহেবের মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সুলতা বোবা। নারীর মর্মস্থলে বেজে উঠল এক সঙ্গে হাজার বেদনার ঝঞ্চনা। সীমা আত্মহত্যা করেছে? কেন? তাহলে কী—?

—কেন আত্মহত্যা করল? সুলতার জিজ্ঞাসা।

জামা খুলে আলনায় ঝুলিয়ে রেখে কৌশিক নিরাসক্ত কণ্ঠে জানাল—আমি কী করে বলবো?

—তবু—?

—বোধহয় মেয়ের অমতে বিয়ে দিচ্ছিলেন বড় সাহেব।

সীমা অন্যের বাগদত্তা! কথাটা শুনেছিল শৌভিকের কাছে। তালে গোলে অতটা খেয়াল করেনি তখন। আজ সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠছে সুলতার সামনে। তাই ঠাকুরপো বিয়ে করতে চায়নি। সে জানতো সীমা অন্যের বাগদত্তা।

কৌশিকের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শৌভিক কোথায় হারিয়ে গেল এ সংসারে। হাতে টাকা পর্যন্ত নিয়ে গেল না ছেলেটা।

অন্তরের কেন্দ্রে কান্নার বিন্দু জন্মালো প্রথমে, তারপর আবর্তের চক্রান্তে কান্নার উত্তাল সমুদ্র মনের পাড়ে অবিরাম ধাক্কা দিতে লাগল। ধাক্কার বেগে সারা দেহটা থরথরিয়ে উঠল কয়েকবার, তার পর হাউ হাউ করে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল সুলতা—ওগো, ঠাকুরপোকে ফিরিয়ে আনো।

নিস্তব্ধ বাড়িতে একটি নীরব কান্না গুমরে উঠতে লাগল মাঝে মাঝে। আর সবাই নিস্তব্ধ নিঃঝুম। বেঁচে আছে কী নেই বোঝার উপায় নেই।

॥ এগারো ॥

মাথা তুলতে পারছে না মীনাক্ষী। অটো ম্যানুয়েল এক্স্‌চেঞ্জের টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে পড়েছিল মীনাক্ষী। বউদিকে সে জীবনের সবকিছু নিঃশেষ করে দিয়ে এসেছে। আজ তার আর কিছুই নেই। এই বিরাট বিশ্বে সে একা।

সামনের বোর্ডে বিন্দু বিন্দু হীরকের মত অজস্র আলো জ্বলে উঠছে। কত লোকের প্রয়োজন মিটোচ্ছে সে দুটি তারের প্রান্ত সংযোগ করে দিয়ে। রিসিভারটা কানে লাগিয়ে অনুসন্ধানের উত্তরে মন দিল সে। ভুলে যাবে শৌভিককে। ভুলে যাবে বিশ্বের সব কিছু। মনের ওপর জ্বলবে শুধু ছোট ছোট আলোর বিন্দু। অমাবস্যার আকাশে হাজার হাজার তারার সমাবেশ। আশাহীন জীবনে স্পন্দনের প্রতীক।

—কী মেম সাহেব, ঘুমোচ্ছেন? ফোনের ওপার থেকে ব্যঙ্গোক্তি ভেসে এল।

—বলুন? কয়েক সেকেণ্ড দেরি হয়েছে মীনাক্ষীর, আর ওপাশ থেকে জেগে উঠেছে কটূক্তি। বাইরের জনসাধারণের ধারণা টেলিফোনের মেয়েরা, তাদের কাজকর্ম ফেলে, বসে বসে কেবল গল্প করে। গল্পের মাঝে দয়া করে যেন লাইন জুগিয়ে দেয় টেলিফোন ভবনের মহিলা কর্মীরা।

—এতক্ষণ ধরে নম্বর চাচ্ছি, কানে যাচ্ছে না? ওয়ার্থলেস। ওপাশ থেকে অধীর কণ্ঠ জেগে উঠল।

কোন জবাব না দিয়ে মীনাক্ষী প্রার্থিত নম্বরের যোগাযোগ করে দিল।

হায়রে মানুষ! ওরা কী জানে মীনাক্ষী সেনের মনের কান্না'

শুধু স্বর শুনে কী মানুষের মনের সন্ধান কেউ পায়? তা যদি পেত, তাহলে আজ ওই ভদ্রলোকটির কণ্ঠে সহানুভূতি জেগে উঠত।

—তোর কি হয়েছে রে? সুপারভাইজার বীণা গুপ্ত পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কই? কিছু হয়নি তো!

—আমার কাছে লুকোস নি। বীণা আরও কাছে এগিয়ে আসে। একেবারে পিঠের কাছে।

—বলছি কিছু হয়নি। বোর্ডের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় মীনাক্ষী।

—মীনা। তোর কাজ আজ পাঁচ বছর দেখছি। আমি তোকে চিনি না? সত্যি করে বল, কী হয়েছে?

—আমাব শরীরটা আজ ভাল নেই।

—সে তো বোর্ডে বসা দেখেই বুঝতে পারছি।

—আমার মাথার ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

—রেস্টরুমে যা। আমি রিলিফ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এয়ার কণ্ডিশন বেস্টরুমের কুশন চেয়ারে নিজেকে ডুবিয়ে দিল মীনাক্ষী। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। ভালভাবে তাকাতে পারছে না সে। এ কী হল তাব? জীবনের এতোগুলো দিন তো বেশ কেটে যাচ্ছিল টেলিফোনের তারের ভিতর নিজের কণ্ঠের বিনিময়। কোথা থেকে উল্কার মত জ্বলে উঠল শৌভিক। তার তাপ সহ্য করতে পারছে না। যত দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা, ততই তার উত্তাপের বৃদ্ধি। শৌভিককে ভূলে যাওয়া যে কত কষ্টকর, এ কথা বউদি বুঝবে কী করে? তবু—তবু তাকে ভুলতে হবে। সে কথা দিয়েছে বউদিকে। তাদের সংসারের সাচ্ছল্যের বিনিময়ে সে শৌভিককে ভুলে যাবে।

—কী রে? কেমন আছিস? বীণাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

—মাথায় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। মীনাক্ষী এড়িয়ে যেতে চায়।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বীণাদি। সে যাচাই করছে মীনাকে। তারপর মুখোমুখি বসে স্পষ্ট ধীর কণ্ঠে বলল, আমায় লুকোস না। কী হয়েছে বল?

কান্নায় ভেঙে পড়ে মীনাক্ষী। এতক্ষণ যে কান্নার বাঁধ কোন রকমে আটকে রেখেছিল বীণাদির স্নেহের স্পর্শে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে গেল। আকুল কান্নায় দু-হাতে মুখ ঢেকে জবাব দেয় মীনা, বীণাদি, আমার সব গেছে।

বীণাদি নারী। মুহূর্তে অনুভব করে আর এক বঞ্চিতা নারীর ব্যথা। কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোন কথা ফোটে না, তারপর মৃদু স্বরে বলে—কাঁদিস্ না। এ জীবনে অনেক কিছু হারাতে হয়।

—কাজ আর স্মৃতি। বীণাদির কণ্ঠস্বর অন্য রকমের হয়ে যায়। যেন সেও অনুভব করছে মীনাক্ষীর কান্নার ভাষা। তারপরেই কণ্ঠ-স্বরকে যথাযথ পরিষ্কার করে বলে—ওঠ, বাড়ি যা। বিশ্রাম করগে।

—ও বাড়িতে আর আমি যাব না। ওখানে শৌভিক যাবেই।

কিছুক্ষণ বীণাদি ভাবে।

মীনাক্ষীর মুখে কোন ভাষা নেই।

—তোর মা ছাড়া আর কেউ আছে ?

মাথা নেড়ে মীনাক্ষা না বলে।

—তাহলে এক কাজ কর। বীণাদি পরামর্শ দেয়—আমার বাসায় তিনখানা ঘর। অতগুলো ঘরের প্রয়োজন নেই। তুই একটা নিতে পারিস।

—কিন্তু এখানে যদি খবর নিতে আসে ?

—এনকোয়ারিতে জানিয়ে দে তোর খবর যেন না দেওয়া হয়। ভিতরে তো ঢুকতে পারবে না। প্রহিবিটেড এলাকা।

পরামর্শ ভাল লাগে মীনার। একটু থেমে সে বলল—কিন্তু ভাড়া ?

—সে তোর সঙ্গে ব্যবস্থা করে নেব। বিনাভাড়ায় রাখার মত ক্ষমতা আমার নিশ্চয়ই নেই।

—বেশ, তাহলে বাড়ি গিয়েই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ঘরের চাবি বার করে, মীনার হাতে দিয়ে

বীণাদি বলল, তুই এগো। আমি ডিউটি শেষ করেই বাড়ি যাচ্ছি।

চাবি হাতে উঠে দাঁড়াল মীনাক্ষী।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রাসাদের চারতলা থেকে লিফ্‌টে চড়ে নেমে এল ভূমিতলে। লিফ্‌টের দরজা খুলে গেল। খোপ থেকে বেরিয়ে এল মীনা। সামনে ডালহাউসীর কর্মব্যস্ত রাজপথ। কত অগণিত লোকের ভিড় সেখানে। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত।

দরজার মুখে এসে পাথর হয়ে গেল মীনাক্ষী।

সামনে তারই অপেক্ষায় দণ্ডায়মান শৌভিক। বুকের ভিতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল একবার। মনের এ চঞ্চলতা দমন করতে হবে। তাকে কঠোর হতে হবে। বউদিকে সে কথা দিয়েছে।

সবল পদক্ষেপে এগিয়ে চলল রাজপথের দিকে।

—মীনা।

এক মুহূর্ত পা দুটো আটকে গেল মেজের সঙ্গে। কী ভীষণ ভারী হয়ে গেছে পা দুটো। তবু এই ভারী পাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। পেছনে তাকালে আর এগিয়ে যাওয়া হবে না।

—মীনা। তোমার সঙ্গে কথা আছে। শৌভিক একেবারে পাশে এসে দাঁড়ায়।

এগিয়ে যাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে মীনাক্ষী।

—কী বল ?

—চলো, বাড়ি যেতে যেতে কথা হবে। শৌভিক এগিয়ে যেতে যেতে বলে।

—বলার আর কী আছে ? মীনার বাঁকা কণ্ঠস্বর।

—তোমার না থাকলেও আমার আছে। শৌভিকের দৃঢ় স্বর।

খানিকটা এগিয়ে যায় উভয়েই। শৌভিক কথাটা পাড়বে কি না ভাবছে। যে কথা উঠবে, দুজনেই জানে। দুজনের মনেই প্রবল ঝড়।

—চলো, আমরা রেজেস্ট্রি বিয়ে করি। শৌভিক প্রসঙ্গটা বলেই ফেলল।

—ছিঃ ! মীনার প্রত্যাখ্যান।—সংসারে শুধু নিজেরটাই চিনতে নেই। তার সঙ্গে অন্য সকলের কথাও ভাবতে হয়।

—আমি কাউকে জানি না। আমি এসেছি আমার কথা বলতে।

—রেজেস্ট্রি বিয়ের মানে সমাজ থেকে পালিয়ে যাওয়া। সে আমি পারবো না। মীনাক্ষী এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে ভাবে, তারপর সরাসরি বলে, যেদিন তোমার বাড়ি আমায় বরণ করে তুলবে, সেই-দিনই আমি প্রস্তাব গ্রহণ করবো, তার আগে নয়।

দৃঢ় পদক্ষেপে মীনাক্ষী এগিয়ে যায়। মর্মর মূর্তির মত নিস্পন্দ নিথর শৌভিক। ডাকবার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে তার। কে যেন তার কণ্ঠস্বরকে চেপে ধরেছে। কোন স্বর ফুটছে না।

ট্রামে উঠে গেল মীনা। দেখতে দেখতে ট্রামটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। অবশ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল শৌভিক। কী করবে সে ? বাড়ি ফিরে যাবে ? না, যে সংসারে তার হৃদয়ের মূল্য নেই, সে সংসার মরুভূমির মতই। অনেকদিন পুরনো অফিসে যায়নি সে। অনেকদিন পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেনি। ব্রজেনের সঙ্গে এক-বার দেখা করলে হয়, তার কাছে অনেক চাকরির খোঁজ থাকে। যদি পায় সে, কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে, বহু দূরে। গ্রামের দিকে। গ্রামে গ্রামে সে ওষুধ বিক্রি করবে। যেখানে আজও আধুনিক চিকিৎসার আলো প্রবেশ করতে পারে নি।

॥ বারো ॥

অফিসের গেটের মুখে ব্রজেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শৌভিকের ব্রজেনের হাতে ওষুধের ব্যাগ, মুখে সেই চিরকালের হাসি।

—কী বাবা ? একেবারে হাওয়া। ব্রজেন আপ্যায়িত করল।

—চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি। ম্লান হেসে শৌভিক বলল।

—চল। কফি হাউসে বসে কথা হবে।

—তোর না ডিউটি?

—মার গুলি ডিউটিতে। আয়।

প্রায় একরকম টানতে টানতে শৌভিককে কফি হাউসে নিয়ে গেল ব্রজেন। অনেক সুখ দুঃখের কথা হল দুজনে। এ কোম্পানীতে ব্রজেনেরও আর ভাল লাগছে না। সে নানা জায়গায় চাকরির সন্ধান করছে। পেলেই ছেড়ে দেবে এই ওঁচা কোম্পানী। সে যদি শৌভিকের মত বিদ্বান হত, তাহলে কবে লাথি মেরে ছেড়ে দিত এই কোম্পানীর চাকরি।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ খেয়াল হল ব্রজেনের। উৎসাহিত হয়ে বলল, একটা চাকরি করবি? আজকের কাগজে বেরিয়েছে।

ব্যাগ থেকে খবরের কাগজটা সামনে মেলে ধরে শৌভিক। দাগ দেওয়া খবরটুকু আহরণ করে নেয় শৌভিক পরমানন্দে। কোন এক ব্যানার্জি ফারমাসিউটিক্যাল্‌স্ বাংলাদেশে ওষুধ বিক্রির জন্য অভিজ্ঞ একজন সেল্‌স্ ম্যানেজার চায়। এম. এসসি হলে ভাল, নিদেনপক্ষে বি. এসসি অথবা বি. ফার্মা।

—তুই অ্যাপ্লাই করলি না কেন?

—আমার বিদ্যে তো জানিস ভাই। কী করে করবো?

—আমি আজই করে দিচ্ছি। কফি শেষ করে শৌভিক উঠে পড়ে।

—বাড়ি তো ছেড়েছিস। থাকবি কোথায়? ব্রজেনের কণ্ঠে সহানুভূতি।

—ঠিক করিনি এখনও।

—যে কদিন কিছু ঠিক না করিস, আমার মেসে চল। গেস্ট হয়ে থাকবি।

শৌভিক নির্বাক। তার চোখের দু কোণে জল টলটল করে ওঠে।

যে ব্রজেনকে কোনদিন সে সাধারণ মানুষের ওপরে ভাবেনি, সেই আজ অসাধারণ হয়ে তার সামনে মূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। গম্ভীর থমথমে গলায় সে জবাব দিল, বেশ তাই হবে।

দিন সাতেকের মুখে 'ব্যানার্জি ফারমাসিউটিক্যাল্'এর চিঠি এল। ইণ্টারভিউ-এর জন্য তলব পড়েছে। আজ দুপুর বারোটায় ইণ্টারভিউ। সে যেন অন্যথা না করে।

—ব্রজেন। এতদিনে বোধহয় ভগবান মুখ তুলে তাকাল। শৌভিক বলল।

—চাকরি হলে বাড়ি ফিরে যা। দাদাদের বোঝালে মিটমাট হয়ে যাবে।

—আমি যাবো না।

—বেশ, তোর হয়ে আমি দেখা করে আসবো।

—সে তুই যা ভাল বুঝিস, করিস্। আমি ওতে নেই।

—আগে তো ইণ্টারভিউ দিয়ে আয়, তারপর অন্য কথা।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর অফিসের হদিস মিলল। ক্যানিং স্ট্রীটের এক মাথা থেকে পোলক স্ট্রীট বেরিয়েছে, তারই একটা দোতলা বাড়ির দুখানা ঘর নিয়ে ব্যানার্জি ফারমাসিউটিক্যাল্স্।

সামনের ঘরে কয়েকজন কেরানী। ওপাশের ঘরে ডিরেক্টর সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বসেন। এই নিয়েই গড়ে উঠেছে 'ব্যানার্জি ফার্মাসিউটিক্যালস্'এর অফিস। ঘরে ঢুকে সামনে বসা ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন—সমীরণবাবু আছেন ?

—কি চাই ? রুক্ষ প্রশ্ন।

চিঠিটা দেখালো শৌভিক। ভদ্রলোক চিঠিটা আদ্যোপান্ত পড়ে বললেন, বসুন আমার চেয়ারে। চিঠি নিয়ে দেখাচ্ছি। ভদ্রলোক চিঠি নিয়ে ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকে গেলেন এবং একটু পরেই বেরিয়ে এসে বললেন—যান, আপনাকে ডাকছেন। শৌভিক নিজেকে একটু ঠিক করে ঢোকে।

ঘরে ঢুকে বিস্ময়ে বোবা।

সামনে চেয়ারের উপর বসে মিটি মিটি হাসছেন সেই ভদ্রলোক, যিনি সীমাকে নিয়ে পালিয়েছিলেন।

—বস্থন। মৃদু হেসে সমীরণবাবু বললেন।

শৌভিক বসে পড়ে। পায়ে জোর নেই তার। যে-কোন সময়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। চেয়ারের আশ্রয়ে কোনমতে নিজেকে সামলায়।

—আপনার নাম দেখেই চিনতে পেরেছি। সমীরণবাবু বললেন—আমার এক বন্ধু কেমিস্ট। তাকে নিয়ে একটা ওষুধের কারখানা খুলেছি। একজন ভালো সেল্‌স্‌ম্যান খুঁজছিলাম, আপনাকে যখন পেয়ে গেলাম তখন আমার আর কোন ভাবনাই নেই। কাল থেকেই কাজে লেগে যান। মাইনে যা বলবেন, তাই দেবো। আপনি সেল্‌স্‌-এর ইনচার্জ।

শৌভিকের কানে এসব কিছুই ঢুকছিল না। তার মনে কেবল এই কথাই গুমরে মরছিল, সীমা আত্মহত্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে ফেললো—সীমার খবর রাখেন?

সমীরণবাবু একটুখানি নীরব থেকে বললেন—আপনি সীমার নাম জানলেন কি করে?

—চক্রধরপুরে যখন ডাক্তারবাবুকে নাম বলছিল, শুনেছিলাম। তাছাড়া—কথাটা শেষ করতে পারে না শৌভিক।

—তাছাড়া? সমীরণ একটা সিগারেট ধরিয়ে, আর একটা শৌভিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন।

—তাছাড়া, আমি তাকে পাত্রী হিসেবে দেখতে গিয়েছিলাম।

—জানি। রহস্যময় কণ্ঠে সমীরণ বলে। মুখে হাসি।

—জানেন? বিস্ময়ে ফেটে পড়ে শৌভিক।

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি বিয়ে করলেন না কেন? বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া মেয়ে বলে?

—না। শৌভিকের গলায় দৃঢ়তা, আমি একজনের ভাবী-স্বামী।

—শুনে আনন্দিত।

—কোন উপায় না পেয়ে সীমা আত্মহত্যা করেছে। শৌভিক জানায়।

—এ স্যাড নিউজ। দুঃখপ্রকাশ করে সমীরণ। শৌভিক অবাক, একটু বিরক্তও। একি! একটি মেয়েকে প্রলুব্ধ করে এমন-ভাবে যে নষ্ট করে দিতে পারে, সে কি মানুষ? তার সঙ্গে কাজ করা আর কারুর পোষায় পোষাক, শৌভিকের পোষাবে না। উঠে দাঁড়ায় শৌভিক।

—ও কি দাঁড়ালেন যে? সমীরণ জিজ্ঞাসা করে।

—এখানে কাজ করব না। শৌভিকের সরাসরি উত্তর।

—বসুন। আদেশের কণ্ঠস্বর সমীরণের, বুঝতে পেরেছি সীমার আত্মহত্যায় আপনার সেন্টিমেন্টে আঘাত লেগেছে। আর ভাবছেন, আমিই এর জন্য দায়ী। কিন্তু যে ভয়ে আত্মহত্যা করে, তার চেয়ে কাপুরুষ আর কেউ নেই।

—এ ছাড়া আর কোন পথও তার খোলা ছিল না।

—ছিল। সে বাইশ বছরের মেয়ে। তারই জবানীর জন্য আমি পুলিসের হাত থেকে রেহাই পাই। সে তো জোর করে বিয়ে করতে পারত। আইনে আটকাতো না।

এ কথার উত্তর নেই। মীনাক্ষীর কথাগুলো বলবে সমীরণকে?

—চলুন। সমীরণ ফাউন্টেন পেনটা পকেটে গুঁজতে গুঁজতে দাঁড়িয়ে উঠে বলে।

—কোথায়?

—আমার বাড়িতে। লাঞ্চ সেরে ওখান থেকে বাড়ি চলে যাবেন।

—আজ থাক। শৌভিক এগিয়ে যেতে চায়।

—কেন? সীমার বদলে অন্য মেয়েকে আমার বউ হিসেবে দেখতে খারাপ লাগবে? এই দুর্বল সেন্টিমেন্টের জন্যেই আমাদের দেশটা গেল। নিন, উঠুন।

একরকম জোর করেই শৌভিককে টেনে তুলে নেয় সমীরণ।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। পাশে নীরব শৌভিক। মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে, তবু ছেড়ে পালাবার উপায় নেই। লোকটার অসম্ভব আকর্ষণ।

—আমি সীমাকে বিয়ে করিনি বলে দাদারও চাকরি গেছে। শৌভিক উত্তর দেয়।

স্টিয়ারিং ঠিক করতে করতে সমীরণ হেসে উত্তর দিল, এ কি একটা সমস্যা? ওঁকেও আমাদের ফার্মে লাগিয়ে দিন।

শৌভিক অবাক। এমন লোক কি করে সীমার প্রতি এতটা বিশ্বাস-ঘাতক হলো? মানুষের চরিত্র বোঝা খুব মুশকিল।

অল্পক্ষণ পরেই সমীরণের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নেমে সমীরণ কলিং-বেলটা টিপে ধরে। একটু পরে দরজা খুলে দাঁড়ালো বাড়ির পরিচারিকা।

—মা কোথায়? সমীরণ জিজ্ঞাসা করে।

—খাবার টেবিলে—।

—আসুন, একেবারে খাবার ঘরে চলে যাই। পেট চোঁ চোঁ করছে খিদেয়।

অনিচ্ছা সত্তেও শৌভিক সমীরণের পিছু পিছু খাবার ঘরে ঢোকে। ভদ্রমহিলা পিছন ফিরে বসেছিলেন। সমীরণ বললো—দেখো, কে এসেছে।

ভদ্রমহিলা মুখ ঘোরাতেই শৌভিক থ। সামনে চেয়ারে বসে সীমা।

শৌভিক নমস্কার করতেও ভুলে যায়।

—কি মশাই, ভূত দেখলেন নাকি?

শৌভিকের মুখে কথা নেই।

—ওঁদের কাছে তো মৃত। মৃদুকণ্ঠে সীমা বললো—আমার নতুন জীবন আরম্ভ হয়েছে।

শৌভিক চেয়ারে বসে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলে—আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

—হবেই তো। সমীরণ হেসে উত্তর দেয়, পৃথিবীটাই যে গোল।

—আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। সীমা বললো—জানি বাবার মনে কষ্ট হবে, কিন্তু আমি নিরুপায়। বাবার সঙ্গে সব সম্পর্ক মুছে ফেলার জন্যেই লিখে এসেছি, আমি আত্মহত্যা করলাম।

—দাও, দাও, খেতে দাও। বড্ড খিদে পেয়েছে।

দুজনের খাবার সাজিয়ে সীমা সামনে দাঁড়িয়ে থাকে তদারকের জন্য। খেতে খেতে সমীরণ বলে, আপনি আমাদের বিয়ের একমাত্র নিমন্ত্রিত অতিথি। গতকাল আমাদের বিয়ে হয়েছে।

বোবা শৌভিক শুধু খেয়ে যায়। মনে মনে ভাবে সে-ও যাবে মীনাক্ষীর কাছে, তাকে বলবে, চলো আমরা বিয়ে করবো, আর কেউ মত দিক আর না দিক, আমরা দুজনে থাকবো।

উন্মাদের মত শৌভিক ছুটল মীনার বাড়ির দিকে।

॥ তেরো ॥

মীনাক্ষীর বাড়ির দরজায় থমকে দাঁড়াল শৌভিক। অচেনা এক ভদ্রলোক দরজায় দাঁড়িয়ে দিবাভোজনের পর ধূমপান করছেন। শৌভিক থতমত ভাব কাটিয়ে জিজ্ঞেস করল, মীনা দেবী আছেন?

—মীনা দেবী? ভদ্রলোক তার কুৎকুতে চোখ দুটোকে আরও ছোট করে জিজ্ঞাসা করলেন, মীনা আবার দেবী হল কবে?

শৌভিকের মনে বিরক্তি, মুখে ভদ্রতার রেশ টেনে বলল, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—সে তো ঘুমোচ্ছে এখন।

—একবার ডেকে দেবেন তাকে? বলবেন শৌভিক এসেছে।

ভদ্রলোক সিগারেটে কয়েকটা টান মেরে বাকী অংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আপনি বোধহয় ভুল করেছেন।

—ভুল কী ঠিক মীনাই বুঝবে।

—বেশ। ভদ্রলোক ভিতরে চলে গেলেন এবং মিনিট কয়েকের

ভিতরে যাকে উপস্থিত করলেন, দেখে শৌভিক হাসবে কী কাঁদবে বুঝতে পারল না।

ভদ্রলোকের কোলে পাঁচ ছয় বছরের একটি সদ্যোজাগ্রত মেয়ে। ঘুম চোখে কাঁদো কাঁদো মুখে দেখছে তার দিকে।

—নমস্কার। কিছু মনে করবেন না। হনহনিয়ে এগিয়ে যায় শৌভিক। মীনা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বউদি নিশ্চয়ই তাকে এমন কিছু বলেছে, যার জন্যে তাকে গা ঢাকা দিতে হয়েছে, সে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়। মীনা নিজেকে নিঃস্ব করে ফেলবে। বেশ। সে যাবে তার অফিসে। সামনাসামনি তাকে সব কথা বলবে। দাদা বউদির সঙ্গে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সে চলে এসেছে। এখন তাকে গ্রহণ করতে আর কোন বাধা নেই। সে চাকরিও পেয়েছে।

টেলিফোন ভবনের সামনে এসে শৌভিক দাঁড়াল। কর্মচঞ্চল ডালহাউসী। দক্ষিণমুখী প্রাসাদ নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে। নীলাভ আলোর নীচে দাঁড়িয়ে মানুষের মনের কান্না কী প্রাসাদের স্নায়ুতন্ত্রে কোনদিন বাজে? বোধহয় না। তাহলে শৌভিকের কান্নার স্পর্শ প্রাসাদের পাথরে সঞ্চারিত হত, আর সেই কান্নার রেশ এই প্রাসাদেরই কোন এক ঘরে বসা মীনার বুকে বাজতো।

শৌভিক চারপাশে তাকিয়ে দেখে। বাঁ দিকের এনকোয়ারি ঘরে কাউন্টারের ওপাশে সংবাদ পরিবেশক খবর বিলিয়ে যাচ্ছেন যাঁরা অপেক্ষায় আছেন, ঘরের মধ্যের কুশন চেয়ারে গা হেলিয়ে বিশ্রাম করছেন। শৌভিক কাউন্টারের মুখে এসে দাঁড়াল ক্ষণিক, তারপর মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলো, মীনাক্ষী সেনকে একটু খবর দেবেন?

অনুসন্ধান-অফিসার চোখ তুলে একবার নীরিক্ষণ করলেন শৌভিককে। ক্ষণিকের জন্য কী ভাবলেন, তারপর জানালেন, মীনাক্ষী দেবীর কোন খবর তিনি জানেন না।

—জানেন না মানে? শৌভিকের মনে মৃদু সন্দেহ।—তিনি কাজ করেন না?

—না। সরাসরি মিথ্যে কথা বললেন অনুসন্ধান অফিসার। বীণাদি এবং মীনাক্ষীর নির্দেশ সেই মতোই ছিল।

শৌভিকের পায়ের তলা থেকে ক্রমশঃ মাটি সরে যেতে লাগল। সে যেন কোন অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। সব কিছু তার ঘোলাটে হয়ে উঠছে।

আর একটু হলে কাউন্টারের ওপর ঢলে পড়ত শৌভিক। কোন রকমে সামলে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে রাজপথে এসে নামল।

কত লোকের যাতায়াত রাজপথ দিয়ে, তবু শৌভিক যেন কত অসহায়, কত একলা। পৃথিবীর জনারণ্যের ভিতর একটিমাত্র লোক হারিয়ে গেলে সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যায়। সব হারিয়ে যায়।

ডালহাউসী থেকে হাঁটা পায়ে সে পোলক স্ট্রীটের অফিসে এসে দাঁড়ায়। সমীরণবাবু তখনও অফিসে কাজ করছিলেন। শৌভিক ঢুকতেই আপ্যায়িত করলেন, বলুন মিঃ মিত্র। কবে থেকে কাজে লাগবেন?

—আজ থেকে যদি হয়, তাহলে, আজ থেকেই করব।

সমীরণ একবার তাকিয়ে দেখল শৌভিকের দিকে। সে দৃষ্টিতে কীসের যেন অন্বেষণ, তারপর হাসতে হাসতে বললেন, এত ব্যস্ত কেন?

—আপনি বুঝবেন না।

—আমি যদি না বুঝি, তাহলে আর কেউ বুঝবে না।

একটু খানি চুপ করে সমীরণ জবাব দিল, বেশ। সেল্স্ বিষয় আমি কিছু বলবো না। আপনার যা খুসী।

—আমি আজই কলকাতার বাইরে চলে যাব। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরবো। ফিরতে মাস খানেক হবে।

—ক্যাশ থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে যান কিছু।

শৌভিক নতুন ব্যাগ হাতে আবার রাস্তায় নামল। ডানহাতে ওষুধের ব্যাগ নিয়ে আবার রিপ্রেজেণ্টেটিভ্ পথের ওপর নেমেছে, নতুন কোম্পানীর ওষুধ, নতুন ভাবে বিক্রী করার তাগিদে। এই তো

জীবন! কখন, কবে যে এক কোম্পানীর খোলস খসে পড়ে, নিজেও বুঝতে পারে না সে। কয়েকদিন বেকার ঘুরে বেড়াবার পর আবার আর এক কোম্পানীর ধড়াচূড়া পরে আসরে নেমে পড়তে হয়।

আজ আর বাসে উঠবে না শৌভিক। সঞ্চয়ের প্রয়োজন নেই। ট্যাক্সীতেই যাবে সে। কী হবে সঞ্চয় করে? কার জন্য সঞ্চয় করবে?

অদূরের স্ট্যাণ্ডে গিয়ে ট্যাক্সীতে উঠল, তারপর ব্রজেনের মেসের দিকে চলল। ব্রজেনকে একটা খবর দিতে হবে। তাকে বলে যাবে যদি দেখা হয়। এই ট্যাক্সীতেই সে সোজা স্টেশনে চলে যাবে।

মেসের সামনে ট্যাক্সীকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে ঢুকল সে। ব্রজেন নেই। তার ঘরে তালা। ম্যানেজারের কাছে খোঁজ করতে তিনি জানালেন, ব্রজেন কলকাতার বাইরে এমার্জেন্সী টুরে গেছে দিন সাতেকের জন্যে।

একটু ভাবল শৌভিক, তারপর খসখসিয়ে চিঠি লিখল সে।

প্রিয় ব্রজেন,

তোকে জানিয়ে যেতে পারলাম না। নতুন কোম্পানীর চাকরি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি ঠিক নেই, কবে ফিরবো তারও ঠিক নেই। শুধু যাচ্ছি এইটুকু জানি।

মীনাকে খুঁজে পেলাম না। বুঝলাম ইচ্ছে করেই গা ঢাকা দিয়েছে। বাড়িতে যাবার ইচ্ছে আর নেই। যে সংসারে আমার পৃথক সত্তার কোন মূল্য নেই, সে সংসারে প্রত্যাবর্তন করে কী লাভ?

তোর জন্যেই চাকরি হল। ব্যানার্জি ফারমাসিউটিক্যালস-এ গিয়ে দেখি পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ধরণের ঘটনা নিত্য ঘটছে। ফিরে এসে সব বলবো। আজ আর সময় নেই, ট্যাক্সী দাঁড় করিয়ে চিঠি লিখছি।—ইতি

শৌভিক চিঠিটা ম্যানেজারবাবুর হাতে দিয়ে বলল, দয়া করে এটা ব্রজেনকে দিয়ে দেবেন।

—দেবো। বাক্সে রাখতে রাখতে ম্যানেজারবাবু বললেন।

শৌভিক বেরিয়ে পড়ল।

আশ্চর্য হয়ে যায় শৌভিক। কলকাতা থেকে এক'শ মাইলের ভিতর বিজ্ঞানের এত অভাব। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রথম পা দিয়েই অবাক হয়ে গেল সে। যতদূর দেখা যায় জল আর জল। মাঝে মাঝে মেটে বাঁধ। উঁচু টিলার ওপর বিচ্ছিন্ন গ্রামের সমষ্টি। একটা গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম যেতে হলে কেবল ভেড়ীর ওপর দিয়ে যেতে হবে, অথবা নৌকোর সাহায্য নিতে হবে। সব নদীগুলোই এখানে যেন রুদ্রমূর্তি ধরেছে। ওপার দেখা যায় না প্রায়।

কানমারী গাঁয়ে লঙ্গর ফেলল শৌভিকের মোটর লঞ্চ। বেড়মজুর, হাটগাছি অঞ্চল সেরে এসেছে সে। ডাক্তার বলতে কিছু নেই সেখানে। দুজন মাত্র কোয়াক্ প্রাক্‌টিশ করেন। একটা ছোট আলমারিতে গোটা কয়েক শিশি সাজিয়ে ডিসপেন্সারীর পত্তন। শৌভিক প্রবেশ করেই একটু অবাক হয়ে তাকে দেখেছিলেন। পরিচয় পাবার পর, তিনি সাহাস্যে বলেছিলেন, এই প্রথম বাইরের লোক দেখলাম।

—অন্য কোম্পানীর কেউ আসেনি?

—কোনদিন নয়।

তারপর আলোচনা শুরু হয়। এ অঞ্চলে পেটের গোলামালই বেশি। লোনা জল আর খারাপ জল খেয়েই অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাব। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে আমাশয়। সকলেরই রক্তাল্পতা সঙ্গী।

কয়েকটা স্যাম্পেল দিয়ে শৌভিক বলেছিল, এগুলো ব্যবহার করবেন আর প্রয়োজন হলে আমাদের কোম্পানীতে লিখবেন। যতটা কম দামে সম্ভব, আমরা পাঠিয়ে দেব।

ভদ্রলোক বিগলিত হয়ে বলেছিলেন, আপনারাও দেশের সেবা করেন, এ কথা সাধারণ লোক ভুলে যায়। আমি নিশ্চয়ই আপনাদের ওষুধ লিখবো।

কানমারীর খাড়াই পাড় ভেঙে ওপরে উঠল শৌভিক। নদীর ধারেই হাট বসেছে। নানা রকমের বিক্রী শুরু হয়েছে গ্রামবাসীদের

মধ্যে। শৌভিক খুঁজতে লাগল কোন ডাক্তারখানা। যদি কোন ডিসপেন্সারী নজরে পড়ে। কিন্তু বৃথা। হাটের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত পাড়ি দিল, কিন্তু কোন ডাক্তারের দোকান নজরে পড়ল না। দু-তিনবার ঘোরাঘুরির পর শৌভিক একজনকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসা করল, এখানে ডাক্তারখানা নেই ?

—ডাক্তারখানা ? সেটা আবার কী ? লোকটি অবাক।

—অসুখ করলে যেখান থেকে ওষুধ নাও তোমরা।

—ও। গঙ্গাগোবিন্দর দোকান !

—সেটা আবার কী ? এবার শৌভিকের অবাক হবার পালা।

—আসুন। লোকটি শৌভিককে নিয়ে চলল একটা দোকানের সামনে।

ছোট মাটির ঘর, খড়ের চাল। দুপাশে গোটাকয়েক মাটির জালা। মাঝখানে মাদুরের ওপর এক পলিত কেশ বৃদ্ধ তামাক টানছে। পরণে ফতুয়া, আর হাঁটু পর্যন্ত ধুতি।

—কী চাই ? ফ্যাঁসফোঁসে গলায় একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন।

শৌভিক দরজার মুখে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল।

ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন।

—নতুন ওষুধ ! কী হবে ?

—অসুখ সারবে।

—ওইগুলো দেখছেন। দু পাশে সাজানো জালাগুলো দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন। শৌভিক ভাল করে দেখে। কতকগুলো জালায় 'গঙ্গা' লেখা, কতকগুলো 'গোবিন্দ' লেখা। কিছু বুঝতে না পেরে মৃদু স্বরে বলল, দেখলাম, কিন্তু বুঝলাম না।

—বুঝিয়ে দিচ্ছি। হুঁকোটা পাশে রেখে পরম বিজ্ঞের মত বললেন, কেঁপে জ্বর এলে গঙ্গা থেকে ওষুধ দিই, আর পেট খারাপ হলে গোবিন্দ জালার ওষুধ দিই। হেসে উঠলেন ভদ্রলোক—কুড়ি বছর ধরে গঙ্গাগোবিন্দ চিকিৎসা করছি। আর নতুন ওষুধ চাই না।

শৌভিক নিথর। মুখ দিয়ে কথা ফুটছে না। এখনও গ্রামে

চিকিৎসার নামে কী প্রহসণ চলছে, শুধু সেই কথাই ভেবে চলে শৌভিক। কলকাতাব বুকে কত চিকিৎসকেব ভিড়, কিন্তু কলকাতাবই সন্নিকটে আজও গঙ্গাগোবিন্দ চিকিৎসা হচ্ছে।

কবে গ্রামেব ঘবে ঘবে চিকিৎসাব আলো পৌঁছুবে? শৌভিক কী দেখে যেতে পাববে?

॥ চৌদ্দ ॥

সংসাবেব নিয়মই বোধহয় এই বকমেব।

কৌশিকেব সংসাবে স্বাচ্ছল্য এসেছে। শৌভিকেব অবর্তমানে যে অর্থকষ্টেব আতঙ্ক হয়েছিল, তাব অবসান হয়েছে বাসু সাহেবেব অকৃপণ দযাব দাক্ষিণ্যে। মাইনে প্রায চাবগুণ হয়েছে, কিন্তু সংসাবেব শান্তি আব ফিবে আসেনি।

শৌভিক বাড়ি ছেড়ে যাবাব পব থেকেই সুলতা একবকম অনাহাবী প্রায়। কিছু খেতে পাবে না সে। যা খেতে যায়। বমি হযে উঠে আসে। কেবল দিনবাত বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। শৌভিকেব নাম ধবে ডাকে আব কাঁদে। কৌশিক যদি খেতে ডাকে, তাকে গালাগালি দিযে ওঠে, বাঃ! চমৎকার ভাই তুমি। সে ছেলেটা বাস্তায় পড়ে আছে। খাচ্ছে কী না খাচ্ছে, তাব ঠিক নেই, আব আমায় বলছো খেতে।

নিরুপায় কৌশিক মায়েব সাহায্য ভিক্ষা করে, কিন্তু সবকিছু ব্যর্থ হয়ে যায়। সুলতাকে কেউ জল পর্যন্ত খাওয়াতে পারে না। অগত্যা কৌশিক ডাক্তাবেব শবণাপন্ন হয়। ডাক্তাববাবু অনেকক্ষণ পবীক্ষা কবেন, তাবপব গম্ভীব হয়ে বলেন, এ কেস অফ অ্যানোবেক্সিয়া নাবভোসা।

—খুব গুরুতব কিছু? কৌশিক চিন্তিত। শঙ্কিত।

—গুরুতর তো বটেই। এমনিতে পেশেণ্টকে কিছুতেই খাওয়ানো যাবে না। গ্লুকোজ দিতে গেলে মারামারি কাটাকাটি করবে। যাব

জন্যে মন খারাপ তাকে না পেলে এ রোগ সারানো অসম্ভব।

ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন।

কৌশিক মায়ের কাছে এসে সব বলল।—কী করা যায় বল তো?

—এক কাজ কর। মায়ের পরামর্শ।—মীনাক্ষীর কাছে যা। তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই খবর পাবি।

পরামর্শ ভাল লাগে কৌশিকের। সুলতার ঘরে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল—মীনাক্ষীর বাড়ি তুমি গিয়েছিলে না?

মাথা হেলিয়ে সুলতা জানায় সে গিয়েছিল। মীনার অফিসের খবরও জেনে নিল কৌশিক, তারপর বলল, বেশ আমি ধরে আনছি ওদের। দেখি কী করে না খাও।

কৌশিক ছুটল মীনার বাড়িতে। অনেকদিন পরে সুলতার ম্লান মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল।

কৌশিক মীনাক্ষীর বাড়িতে গেল। সে নেই। বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। কিছুক্ষণ বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজার মুখে, তারপর স্থির পায়ে চলল টেলিফোন ভবনের দিকে।

বীণাদি দাঁড়িয়ে ছিল এন্‌কোয়ারি অফিসের মুখে। ডিউটিতে যাবার জন্যে লিফ্‌টএর অপেক্ষায় অফিসের কোণে দাঁড়িয়ে লোক-জনের যাতায়াত দেখছিল, এমন সময় সেখানে প্রবেশ করল কৌশিক। চোখেমুখে একটা অজানা ভয়, কী যেন হারিয়ে যাবার আশঙ্কা। দু-একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল কৌশিক।—আচ্ছা বলতে পারেন মীনাক্ষী সেনের দেখা পাব কখন?

অফিসার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন এক মুহূর্ত, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে?

—আমি তাঁর আত্মীয়। বড্ড জরুরী দরকার।

মীনার নাম কানে যেতে বীণাদি একটু এগিয়ে এল। ভালভাবে লক্ষ্য করল কৌশিককে। না চেনা কেউ নয়।

—কি ব্যাপার বলুন তো? বীণাদি প্রশ্ন করল কৌশিককে।

—আমার স্ত্রী মুমূর্ষ। তাকে বাঁচাবার জন্য মীনাকে দরকার।

বীণাদি এক মুহূর্ত কী ভাবল, তারপর বলল, আপনি অপেক্ষা করুন। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লিফ্‌টে করে বীণাদি ওপরে উঠে গেল। কৌশিক অস্থির পায়ে এনকোয়ারি অফিসে ছটফট করতে লাগল। এক মিনিট যেন আর কাটতে চায় না। যতবার লিফ্‌ট নামে, অধীর অপেক্ষায় লক্ষ্য করে কৌশিক। অনেকে নামছে কিন্তু যাকে সে খুঁজছে, সে আর নামে না। প্রতীক্ষা বোধহয় এমনিই জিনিস।

মিনিট পনেরো পরে মীনাক্ষী লিফ্‌ট বেয়ে নেমে এল। লিফ্‌টের দরজা খুলে যেতেই সামনে কৌশিককে দেখে কেমন যেন বোবা হয়ে গেল। কৌশিকের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল মীনাক্ষী। অনিদ্রার ছাপ চোখেমুখে। একটা জমাট দুশ্চিন্তা সারা দেহে।

—কী হয়েছে? মীনাক্ষী এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল।

—শৌভিক কোথায়? কোনমতে ঢোঁক গিলে প্রশ্ন করল।

শৌভিক বাড়ি নেই! এক ঝলক রক্ত চলকে উঠল হৃৎপিণ্ডের ভিতর। সে তাহলে নববধূ নিয়ে সংসার করেনি। তারই প্রত্যাশায় সে তাহলে কোথাও বসে আছে!

এ প্রত্যাশা নারীর পরম সম্পদ। চোখ বুজে এক মুহূর্ত অনুভব করল মীনাক্ষী।

—জানো তুমি তার ঠিকানা?

মাথা নেড়ে মীনা জানাল সে জানে না। কথা বলার ক্ষমতা তার নেই।

—তোমার বউদি বোধহয় বাঁচবে না।

মীনা স্তম্ভিত। বউদি মৃত্যুশয্যায়।—কী হয়েছে?

—কী জানি? তোমরা চলে যাবার পর, আর সে কিছুই খায় না।

—আপনার ভাই বাড়ি থাকে না।

—না। সেই দিনই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

এক মিনিট মীনা কী ভাবল, তারপর কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন।

—এ কি চেহারা করেছো বউদি? বিছানার পাশে বসে পড়ল মীনা।

সুলতার মুখে ম্লান হাসি। চোখের কোলে পুরু কালি।

—এবার নিশ্চয়ই খাব।

মীনাক্ষী নিজেই রান্নার ভার তুলে নিল। সুলতার কথা সে কিছুতেই শুনল না। বেশি জোর করতে সে বলল, আমার হাতে খেতে তোমার ঘেন্না করবে?

—কী যে বল তুমি? সুলতা আর কোন কথা বলতে সাহস করে না।

মীনাক্ষী রান্না শেষ করে ভাত বেড়ে সুলতার সামনে এনে রাখে।

—এত খাবো কি করে? সুলতা মৃদুস্বরে বলল।

—যা পারো খাও।

—কিন্তু মীনা। একটুখানি চুপ করে সুলতা, তারপর আবার বলে—একজন যে অভিমানে এখনও পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—কিছু ভেবো না। তাকে ফিরিয়ে আনার ভার আমার ওপর।

সুলতা নিঃশব্দে আহারে বসল। অনেকদিন পরে সে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে, সে ভরসা পেয়েছে। সংসারে আর একজন এসেছে তার পাশে দাঁড়াবার জন্য।

বিকেল বেলায় ব্রজেন কৌশিকের বাড়ি এসে হাজির হল। ব্রজেনকে এর আগে কোনদিন দেখেনি। একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—আপনাকে ঠিক—।

—চেনা সম্ভব নয়। হাসতে হাসতে ব্রজেন বলল।—আমি শৌভিকের সঙ্গে কাজ করতাম।

শৌভিকের নাম শুনে সাদর আপ্যায়ণ জানায় কৌশিক।—আসুন, আসুন।

শৌভিকের চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বলে, চিঠিখানা দিতে এসেছিলাম। সে চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেছে। এবার ফিরিয়ে আনার ভার আপনাদের।

—তার ঠিকানা ?

—কোথায় আছে জানি না। তবে অফিসের ঠিকানা দিতে পারি। ব্যানার্জী ফারমাসিউটিক্যালস্-এর ঠিকানা দিয়ে ব্রজেন বলল।

—আপনি ভেতরে আসুন। অন্ততঃ চা খেয়ে যান।

—আজ নয়। শৌভিক ফিরে আসুক, তারপর।

ব্রজেন বিদায় নেবার পরও অনেকক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল কৌশিক। চিঠিখানা আর একবার দেখল সে। কালই সে ব্যানার্জী ফারমাসিউটিক্যাল্স্-এ যাবে। সব কথা জানিয়ে শৌভিককে সে ফিরিয়ে আনবে। আবার তার সংসার হাস্যমুখর হয়ে উঠবে।

॥ পনেরো ॥

কৌশিককে বেশি ঘুরতে হল না সমীরণের অফিসের ঠিকানা খুঁজে বের করতে। যে করেই হোক শৌভিককে বাড়ি ফিরিয়ে আনতেই হবে। তার নিজের সংসারের সুখ শান্তির বিনিময়ে আজ শৌভিককে বড় প্রয়োজন। সুলতা যে ভাবে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে অমোঘ ওষুধ দিতে না পারলে, মৃত্যু অবধারিত, আর সেই ওষুধ একমাত্র শৌভিক।

ব্যানার্জী ফারমাসিউটিক্যাল্স্-এর অফিসে ঢুকে ইতস্ততঃ এদিক ওদিক তাকাল। তিন চারজন লোক আপন মনে কাজ করে চলেছে। একজনকে দেখে মনে হল স্টেনোগ্রাফার। টাইপ-রাইটারের সামনে চুপচাপ বসে আছে।

কৌশিক পায়ে পায়ে তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, সমীরণ বাবুর

সঙ্গে দেখা করতে চাই একটু।

কৌশিকের আপাদ-মস্তক এক নজরে দেখে নিলেন ভদ্রলোক, তারপর নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন, নো ভেকেন্সি।

—চাকরির জন্যে আসিনি। মৃদু স্বরে কৌশিক বলল—ব্যাপারটা একটু ব্যক্তিগত।

একটু থেমে ভদ্রলোক এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন। —নাম ঠিকানা লিখে দিন এতে।

কৌশিক নিজের নাম লিখল, তার নীচে লিখল শৌভিকের দাদা।

নিজের চেয়ার ছেড়ে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সমীরণের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন—আপনি চেয়াবটায় বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি।

শূন্য চেয়ারটা দখল করে বসল কৌশিক কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই উঠতে হল আবার। স্টেনো ফিরে এসেছেন, সঙ্গে সুখবর।—সাহেব ডাকছেন আপনাকে।

কাচ-দরজা ঠেলে কৌশিক পাশের ঘরে ঢুকল। সমীরণ কতকগুলো জরুরী চিঠি পত্র পড়ছিল মুখ দেখে মনে হল। কৌশিকের পায়ের শব্দে একবার মুখ তুলে তাকাল, তারপর আবার কাগজ পত্রের ভিতর ডুবে গেল। কাগজে সই করতে করতেই বলল—বসুন।

কৌশিক সামনের একটা খালি চেয়ার দখল করে বসল।

এক এক করে সব কাগজে সই হয়ে যাবার পর সেগুলো ঠেলে একদিকে সরিয়ে দিয়ে বলল—বলুন।

—শৌভিককে ফিরিয়ে দিন আপনি। ধরা গলায় কোনমতে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল কৌশিক।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সমীরণ। তার চোখ দুটো কৌশিকের ভেতর কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। শৌভিক সব কথা তাকে খুলে বলেনি নিশ্চয়ই। শৌভিকের জীবনের কোন এক অধ্যায়, তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

সমীরণ একই ভাবে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, পুরো ব্যাপারটা আমায় খুলে বলবেন ?

ধীরে ধীরে কৌশিক সব কথা খুলে বলে। কিছুই লুকোয় না। আজ আর লুকোবার প্রয়োজন নেই।

সমীরণ ধীরকণ্ঠে জবাব দিল—আমি কি করতে পারি বলুন ?

—আপনি তাকে ফিরিয়ে এনে দিন। কৌশিকের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল থরথরিয়ে—সে না ফিরলে, তার বউদি বাঁচবে না।

—তাকে ফিরিয়ে আনা খুব মুস্কিল।

—যে করে হোক তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

—বেশ। টেবিলের গায়ে কলিংবেলের বোতাম টিপে ধরল সমীরণের হাতের আঙুল। সঙ্গে সঙ্গে স্টেনোগ্রাফারের প্রবেশ।

—একটা চিঠির ডিক্টেশন নিন।

খাতা পেনসিল হাতে দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালেন স্টেনোগ্রাফার।

—চিঠিটা পাঠাবেন শৌভিক মিত্রকে। তাকে লিখে দিন, সে যেন চিঠি পাওয়া মাত্র কলকাতায় ফিরে আসে। সমীরণ উঠে দাঁড়ায়।—আর লিখে দিন, ইয়োর সার্ভিস ইজ নো মোর রিকোয়ার্ড।

কৌশিক বিবর্ণ। এ কি হল! কি করতে এসে, কি হয়ে গেল। না, না, শৌভিকের চাকরি এই সামান্য কারণে চলে যাবে? এই দুর্দিনে।

—না, না এ আপনি করবেন না। কৌশিকের আকুল আবেদন।

—এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। নির্বিকারভাবে সমীরণ উত্তর দিল, তারপর গম্ভীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কৌশিকের মুখে কোন কথা নেই। কথা বলার শক্তি নেই তার। বিচিত্র জগত। বিচিত্রতর ধনী সমাজ। তাদের খেয়াল খুসীর অন্ত পাওয়া ভার। পৃথিবীর সব পুঁজিপতি একই রকমের। যখন যা খেয়াল হয়, তাই করে। ওরা বোঝে না, ওদের সামান্য ইচ্ছেতে, একটা সংসার ছারখার হয়ে যায়। হয়ত বা বোঝে, বুঝেই বেশি করে।

মীনাক্ষী সুলতার মাথার কাছেই বসে আছে কদিন থেকে। রোগের দাপটটা যেন বেড়েছে কদিন। রোগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাইরের পৃথিবীও দাপাদাপি শুরু করেছে। কলকাতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যেন বৃষ্টির জলপ্রপাত। দুর্যোগ যেন অট্টহাসি হেসে চলেছে ক্ষণে ক্ষণে। আকাশ চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি চলছে। বজ্রের শব্দে বুকের পাঁজরগুলো কেঁপে উঠছে প্রতি মুহূর্তে।

—ওই এলো বোধহয়। বাতাসের শব্দে সুলতার প্রলাপ আরও বেড়ে যায়।

একটা চাপা নিশ্বাস মীনাক্ষীর। মৃদু ভাবে সুলতার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—একটু ঘুমোও বউদি।

নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে সুলতা।

পাশে দাঁড়িয়েছিল কৌশিক। এ কদিন সেও এক ভাবে সুলতার শিয়রে দাঁড়িয়ে। তারও বুকের ভেতর অজানা আতঙ্কের দপদপানি। সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে সংসার থেকে। টাকা পয়সা স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নতি, সব কেমন যেন অনর্থক মনে হচ্ছে এ কদিন। সবকিছুর বিনিময়ে আজ সে ভগবানের কাছে নীরব প্রার্থনা করছে সুলতার জীবন।

—সে বোধহয় আর এলো না। রোগিনীর জ্বরাতুর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

মীনাক্ষী একবার কৌশিকের দিকে তাকায়। সে দৃষ্টি থেকে চোখ দুটো সরিয়ে নেয় কৌশিক। বন্ধ জানালার দিকে তাকায় সে। বাইরে পৃথিবীর ষড়যন্ত্র চলছে পুরোমাত্রায়। ওরা আসতে দেবে না শৌভিককে। সুলতাকে সুস্থ হতে দিতে চায় না নিয়তি। যদি নিয়তির কুচক্র না হবে, তাহলে এই সময়তেই এই রকমের দুর্যোগ হানা দেবে কেন?

—সে কী আসবে না দাদা? মীনাক্ষী ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—জানি না। ধরা গলায় কৌশিকের জবাব।—সে হয়ত চাকরি নেই দেখে আরও দূরে কোথাও পালিয়েছে।

কড় কড় করে একটা বজ্র পড়ল কাছে কোথাও, আর তারই সঙ্গে

বাইরে জেগে উঠল শৌভিকের কণ্ঠস্বর—বউদি, আমি এসেছি।

কৌশিক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মীনাক্ষীর মনের ভিতর কিসের বাজনা বেজে উঠেছে। দু-হাতে বউদিকে নাড়া দিয়ে চাপা স্বরে বলল—বউদি, ও এসেছে।

জ্বরের ঘোরে একবার চোখ খুলল সুলতা। মীনাক্ষীর কথা ঠাহর করতে পারল না যেন। আবার চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে রইল।

—বউদি, আমি এসেছি। সর্বাঙ্গ সিক্ত শৌভিক ঘরে ঢুকে সুলতার কাছে এসে দাঁড়াল। পেছনে সমীরণ। সে মৃদু হেসে কৌশিককে বলল—আপনার ভাইকে দিয়ে গেলাম। ভয় নেই, চাকরি ওর যায়নি। আজ চলি। সমীরণ আবার বেরিয়ে গেল।

—বউদি। ঝুঁকে পড়ে শৌভিক ডাকল আবার।

সুলতা একবার চোখ খুলে দেখল শৌভিককে। চেনবার চেষ্টা করল যেন।—তুমি ঠাকুরপো ?

—হ্যাঁ বউদি। আমি এসেছি।

—মীনা—। হাতটা হাতড়ে বেড়াতে লাগল সুলতা।

—এই যে। কাছে গিয়ে দাঁড়াল মীনাক্ষী।

মীনাক্ষীর হাতখানা, শৌভিকের হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে সুলতা বলল—আমার কাজ শেষ হল।

তারপর একটা গভীর তৃপ্তির নিশ্বাস।

—তুই জামা-কাপড় ছেড়ে আয়। কৌশিক এতক্ষণে কথা বলল।

—বউদির এ অবস্থা কবে থেকে ?

—তুই যাবার পরই।

নিঃশব্দে শৌভিক পাশের ঘরে গেল জামা-কাপড় বদলাতে। মা এককোণে মালা জপছেন একমনে। তাঁর কোলের কাছে খুকু ঘুমিয়ে পড়েছে। গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে আছে অঘোরে।

জামা বদলে, শুকনো জামা-কাপড় পরা মাত্র মীনাক্ষী ঘরে এসে ঢুকল।—শিগগীর এসো, বউদি কেমন করছে।

শৌভিক ছুটে এ ঘরে এসে পাথর হয়ে গেল। বউদির ঘনঘন

নিশ্বাস পড়ছে। বুকের হাঁপর যেন আরও বাতাস চাইছে। সারা বিশ্বের বাতাস ওর কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

—একজন ডাক্তার। শৌভিকের অসহায় কণ্ঠস্বর।

—থাক। কৌশিক নির্বিকার। শিয়রের কাছে বসে সুলতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।—যাবার সময় একটু শান্তি পাক।

আবার বজ্রাঘাত। পৃথিবীটা কেঁপে উঠল থরথর করে। শৌভিকের পা দুটো অচল হয়ে গেছে একেবারে। সামনে বিছানার ওপর স্থির হয়ে রয়েছে তার বউদি। নীরব নিথর হয়ে গেছে চিরকালের মত। আর কোনদিন কোন অভিযোগ, কোন অভিমান, কোন আবদার ফুটে উঠবে না ওই দুটি ঠোঁটের ফাঁকে।

শৌভিক আর দাঁড়াতে পারে না। ছুটে পাশের ঘরে পালিয়ে যায়। মা সেই এক ভাবেই জপের মালা ঘুরিয়ে চলেছেন। খুকু নিঃশব্দে ঘুমিয়ে আছে। ও ঘরের বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছে। শৌভিক কাঁদতে পারছে না। তার কান্না যেন কে কেড়ে নিয়েছে।

খাটের ওপর বসে পড়ে অস্ফুট স্বরে মাকে বলল—মা।

মা নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন।—জানি। সবই তাঁর লীলা।

শৌভিক বাইরের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে একবার। সবাই কাঁদছে। পৃথিবীর কান্না আকুল বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে আকাশের গাল বেয়ে।

জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় শৌভিক। জানালার পাল্লাটা এক-টানে খুলে ফেলে। এক ঝলক বৃষ্টির জল চোখেমুখে ছিটকে লাগল। চোখের দু ধারায় বৃষ্টির জলে, চোখের জলে এক হয়ে গেল। সামনের আকাশ অন্ধকার অচেনা একেবারে।

(০—০)

॥ শেষ ॥